গ্রহ-নক্ষত্র

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্—এলাহাবাদ
১৯২০

[মূল্য ১৸০ এক টাকা বারো আনা]

প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ।

ও

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড হইতে
শ্রী অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

বিজ্ঞ পাঠক দুই-চারি পৃষ্ঠা উলটাইলেই বুঝিবেন, পুস্তকখানি তাঁহাদের জন্য লেখা হয় নাই। অল্প বয়সে জ্যোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইতাম, ইচ্ছা হইত সমবয়স্ক দুইচারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি; কিন্তু তখন ইহা হইয়া উঠে নাই। বাল্যের সেই সাধটি প্রৌঢ় বয়সে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, ছেলেদের মনের মত করিয়া বইখানি লিখিতে পারিলাম কি না।

ছেলেদের জন্য জ্যোতিষের বই লিখিতেছি জানিয়া আমেরিকার ফ্লাগস্টফ্ মানমন্দিরের ভুবনবিখ্যাত জ্যোতিষী লাওয়েল্ সাহেব বড় দূরবীণে উঠানো গ্রহ-নক্ষত্রের অনেকগুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছবিরই কতকগুলি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই সুযোগে লাওয়েল সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন।
আশ্বিন ১৩২২

শ্রীজগদানন্দ রায়।

যাদব,

যখন বইখানি লেখা হইতেছিল, তখন কতক অংশ পড়িয়া আশ্রম বালকদের শুনাইয়াছিলাম; ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যখন তুমি রোগ-শয্যায় শয়ান, বই ছাপা হইল কিনা, তখনো সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে; বড়ই আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে পারিলাম না। তাই আজ এখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।

তোমার মশাই

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নক্ষত্রদের জন্ম	২৭৩
নীহারিকা	২৮১
সৌর-জগতের উৎপত্তি	২৮৭
নক্ষত্র-চেনা	২৯৫
আমাদের জ্যোতিষ	৩১৫

সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
আমাদের পৃথিবী	১
গ্রহ-উপগ্রহ	১৮
সূর্য্য	২৭
সূর্য্যের কলঙ্ক	৩৬
সূর্য্যের গ্রহণ	৪৩
সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল	৫২
সূর্য্যের ছটা-মণ্ডল	৫৯
সূর্য্যের আলোক ও তাপ	৬৪
মহাপ্রলয়	৬৯
চাঁদ	৭২
চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বত	৮০
চাঁদের উপরকার অবস্থা	৮৯
চাঁদের কলঙ্ক	৯৩
চাঁদের কলা	৯৭
চাঁদের গ্রহণ	১০৩
চাঁদে মানুষ আছে কি ?	১০৮
চাঁদের দিবা-রাত্রি	১১১
চাঁদের মৃত্যু	১১৫
পৃথিবীর মৃত্যুভয়	১১৯
সূর্য্যের ছোট গ্রহ	১২১

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বুধ	১২৩
শুক্র	১৩৪
মঙ্গল	১৪৫
মঙ্গলের চাঁদ	১৫৯
সূর্য্যের বড় গ্রহ	১৬৫
গ্রহকণিকা	১৬৬
বৃহস্পতি	১৭০
বৃহস্পতির চাঁদ	১৭৭
শনি	১৮৩
শনির চক্র	১৮৮
শনির চাঁদ	১৯১
ইউরেনস্	১৯৪
নেপচুন্	২০৫
ধূমকেতু	২১৩
হ্যালির ধূমকেতু	২২৫
ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি	২৩১
উল্কাপিণ্ড	২[illegible]
নক্ষত্র	২৫৬
নক্ষত্রদের সংখ্যা	২৬০
নক্ষত্রদের দূরত্ব	২৬২
নক্ষত্রদের অবস্থা	২৬৫
যমক নক্ষত্র	২৬৭
নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ?	২৬৯

গ্রহ-নক্ষত্র

আমাদের পৃথিবী

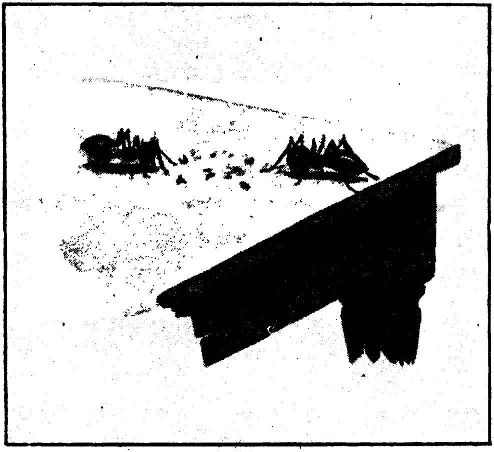
জ্যোতিষীরা বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত একটি। সূর্য্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্ব্বদাই গরম থাকিয়া জ্বলিতেছে, পৃথিবী অবশ্যই সে-প্রকার জ্বলিতেছে না। ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের আলো আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, পৃথিবী সেই আলোতে আলো পায়। পৃথিবী ছাড়িয়া যদি তোমরা চাঁদে বা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে সেখান হইতে সূর্য্যের আলোতে আলোকিত এই পৃথিবীকে চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখিবে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি, তাহার আকার কি রকম ?

খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে মনে হয়, যেন পৃথিবীটা আমাদের ফুট্‌বল্‌খেলার মাঠের মত সমতল।

প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়। পৃথিবী কখনই ফুট্‌বলের মাঠের মত সমতল নয়,—ইহা ফুট্‌বলেরই মত গোল।

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিল সমতল,

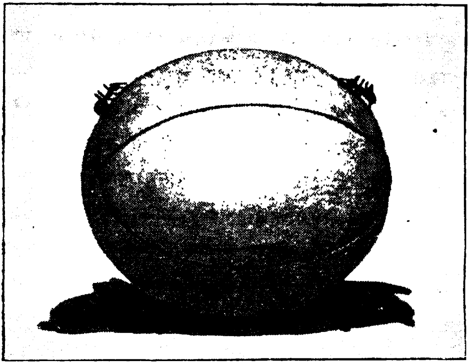


টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

এদিকের পিপীলিকা ওদিকের পিপীলিকাকে দেখিতে পাইবে না কি?—নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

এখন মনে করা যাউক, যেন একটা ফুটবল্ সূতা দিয়া

ঝুলাইয়া রাখা গিয়াছে এবং তাহার উপরে দুইটি পিপীলিকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে,



ফুটবলের উপরে দুইটি পিপীলিকা

দুইটি পিপীলিকা একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না।

আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিকা উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে অবশ্যই দুইয়েরই দেখা-শুনা হইবে; কিন্তু হঠাৎ হইবে না। উপরের পিপীলিকাটি প্রথমে নীচের পিপীলিকার সেই লম্বা লম্বা শুঁয়ো দুটি দেখিতে পাইবে। তার পরে তাহার দেহের সর্ব্বাংশই দেখিতে পাইবে।

যে-সকল সাঁকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা যায়।

মনে কর, একটি লোক এইরকম একটা সাঁকোর এক-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা গাড়ী সাঁকোর উপরে আসিতেছে। লোকটি প্রথমে গাড়ীখানা দেখিতে পাইবে না। কারণ, সাঁকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আট্‌কাইয়া দিবে। ইহার পরে গাড়ী সাঁকোর উপর অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাগড়ীটা, তার পরে গাড়ীর ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গরু ও চাকা নজরে পড়িবে।

তোমরা যদি কলিকাতায় ভাগীরথীর উপরকার হাওড়ার পুল দেখিয়া থাক, তবে ঐ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মতই ঢালু। কলিকাতার দিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া যদি হাওড়া ষ্টেশনের গাড়ীগুলা কি-রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ী-গুলাকে দেখিতেই পাইবে না। তার পরে সেগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পাইবে।

আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সত্যই ঢালু, তাহা ঐ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে।

সহরের মধ্যে বা অপর জায়গায় এই পরীক্ষা করা যায় না, কারণ ঘর-বাড়ী পাহাড়-পর্ব্বত সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। সমুদ্রেই এই পরীক্ষার



একটা ছোট নদী। তাহার উপরে একটি সাঁকো। সাঁকোর এক প্রান্ত হইতে একটি লোক ও অপর প্রান্ত হইতে একখানি গাড়ী সাঁকোর উপরে আসিতেছে।

উপযুক্ত স্থান। সেখানে ঘর-বাড়ী নাই, পাহাড়-পর্ব্বত প্রায়ই দেখা যায় না; বৃহৎ জলরাশি চারিদিকে ধূ ধূ করে। জাহাজে চড়িয়া যখন সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া যায়, তখন খুব দূরের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই ঐ ঢালু অংশ মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দূরের জাহাজগুলিকে আড়াল দিয়া রাখে। তার পরে সেগুলি যতই নিকটে আসিতে থাকে, একে একে তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের চোঙ কিংবা মাস্তুল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কাম্‌রা ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাটা নজরে পড়ে।

ফুট্‌বলের পরীক্ষাতেও আমরা উহাই দেখিয়াছিলাম। নীচের পিপীলিকা যখন উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা করিতে চলিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-শুনা হয় নাই। প্রথমে তাহার শুঁয়ো দেখা গিয়াছিল, তার পরে আরো অগ্রসর হইলে তাহার পা-গুলি-পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে দেখা গিয়াছিল। সাঁকোর উপর দিয়া গাড়ী আসার উদাহরণেও আমরা ঐ-রকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর ছাদ, তার পরে গরুর মাথা এবং শেষে গাড়ীর সকল অংশ দেখা গিয়াছিল। খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের যাওয়া-আসাতেও ঐ-প্রকার দেখা গেল। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা ফুট্‌বলের মত ঢালু।

দু'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা যায় না ; সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপরে দাঁড়াইয়া যখন অনেক দূরের জাহাজকে আসিতে দেখা যায়, তখনি উহা জানা যায়।

ফুট্‌বলের বেড় মাপিলে তাহা দেড় ফিট্ বা দুই ফিটের অধিক হয় না ; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল এবং মাটির ভিতর দিয়া মাঝখানটা মাপিলে প্রায় চারি হাজার মাইল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের পৃথিবীকে ফুট্‌বলের সঙ্গে তুলনা করা গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্‌বলটি যে কত বড় তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। তার উপরে আবার পণ্ডিতেরা বলেন, বিনা সূতায় ফুট্‌বলকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার বৃহৎ পৃথিবীটি ঠিক সেই-রকম আকাশে বিনা-সূতায় ঝুলিয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে। আমরা পৃথিবীর উপরকার ক্ষুদ্র প্রাণী, কাজেই আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায় ?—ইহার প্রমাণ আছে। গাড়ী, নৌকা বা ষ্টীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, জলের শব্দে এবং তাহার হেলা-দোলাতে আমরা বুঝিতে পারি, যে আমরা চলিতেছি। পৃথিবী চলিবার সময়ে সে-প্রকার কাঁপুনি দেয় না, হেলে না, দোলে না এবং শব্দও করে না ; কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলিয়াও বুঝিতে পারি না যে, আমরা চলিতেছি। মহাসমুদ্রের মাঝে যদি এমন

একখানি ষ্টীমারে চড়িয়া যাওয়া যায় যে, যাহার কলের ঝন্-ঝনানি নাই, হেলা-দোলা নাই, তাহা হইলে যেমন আমরা বুঝিতে পারি না যে, ষ্টীমার চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে, তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়াও আমার তাহার চলা বুঝিতে পারি না। এই কথাটা খুব অদ্ভুত, কিন্তু অদ্ভুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য।

প্রাতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। তার পরে যত বেলা বাড়িতে থাকে, সূর্য্য তত আকাশের উপরে উঠিতে থাকে; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত যায়। রাত্রিতেও দেখা যায়, চাঁদও সেই রকম করে। চাঁদ যেখানেই থাকুক্, এক-একটু করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। কেবল চাঁদ নয়, রাত্রিতে যে-সকল ছোট-বড় নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়, তাহারাও পূর্ব্বদিক্ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্রদের এই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়া অস্ত যাইবার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? পাখী যেমন আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের আম গাছ হইতে উড়িয়া মাথার উপর দিয়া চলে এবং শেষে পশ্চিম দিকের বটগাছে গিয়া বসে, চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই-রকমে আকাশের উপর দিয়া উড়িয়া চলে? ইহারা পূর্ব্ব হইতে

সত্যই যে পশ্চিমে চলিয়া অস্ত যায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কারণ, ইহা আমরা নিজের চোখেই দেখিতে পাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, ঠিক উল্টা কথা। ইঁহারা বলেন, সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; আমাদেরপৃথিবীই কেবল লাট্টুর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক গোলাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরপাক্ খাইতেছে। ইহাতেই সূর্য্যের ও নক্ষত্রদের উদয়-অস্ত দেখা যায়।

বোধ হয় এই কথাটা বুঝিলে না। আচ্ছা মনে কর, তুমি যেন সূর্য্য হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলে এবং তোমার বন্ধু ধরণীকে বলিলে, "আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও।" ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখন যেন তুমি তাহাকে বলিলে, "উঁহুঁঃ! হ'ল না। তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াও।" ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, কিন্তু মনে কর, যেন সে তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং তুমি মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলে।

এই ঘুরপাক-খেলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি স্থির আছ, ধরণীই ঘুরিতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীকে লইয়া আমাদের সূর্য্য মহাকাশে এই-রকম একটা ঘুরপাক খেলা করে। সূর্য্য তোমারি মত আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত সূর্য্যের

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল ঘুরিয়া বেড়ানো নয়, ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়াছিল, আমাদের পৃথিবীও ঠিক সেই-রকমেই নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

মনে কর, যেন একটি পরিষ্কার টেবিলের মাঝে একটা ল্যাম্প্ রাখিয়া, সেই টেবিলের উপরেই একটা লাট্টু ঘুরানো যাইতেছে। এখন যদি এই লাট্টুকে ল্যাম্পের চারিদিকে চালাইয়া লওয়া হয়, তবে আমাদের সেই ঘুরপাক-খেলার ধরণীর মত লাট্টু নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে ল্যাম্পের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্য ল্যাম্পের মত স্থির হইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবীটাই কেবল নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্য্যের চারিদিকে দিবারাত্রি ঘুরিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু পৃথিবী এই রকমে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন লয়।

পণ্ডিতেরা এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি-রকমে স্থির করিলেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

আমরা যখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কোনো স্থানে যাই, তখন পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ-পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা যেদিকে যাইতেছি, পথের ধারের ঐ জিনিষগুলা যেন ঠিক তাহার উল্টা দিকে

ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় চড়িয়া যখন যাওয়া যায়, তখনো নদীর ধারের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ও ঘাটে-বাঁধা নৌকা-গুলিকেও ঐ-রকম উল্টা দিকে চলিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই। কিন্তু মনে হয়, যেন পথের পাশের সব জিনিষই ছুটিয়া চলিয়াছে।

পণ্ডিতেরা আমাদের চোখের এই ভুলটাকে দেখিয়া বলেন, আমরা যেমন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা সকলেই সেই প্রকারে পৃথিবীতে চড়িয়া বসিয়া আছি। কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের ঘাড়ে লইয়া লাটুর মত বন্‌-বন্‌ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিতেছে। কাজেই, সূর্য্য তারা প্রভৃতি যে-সকল জিনিষ আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা উল্টাদিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি।

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহা দেখিতে পাই, পৃথিবীর মত একটা প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা তাহাই দেখিতে পাইব, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা যখন ঝাঁকুনি না দিয়া নিঃশব্দে চলে, তখন চোখ্‌ বুজিয়া বসিয়া থাকিলে, চলিতেছি কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জানালায় উঁকি দিলে যখন দেখা যায় যে, পথের পাশের গাছ-পালা বা নদীর ধারের ঘর-বাড়ী চলিতেছে, তখন এই সব দেখিয়াই ঠিক করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে। পৃথিবী ঝাঁকুনি

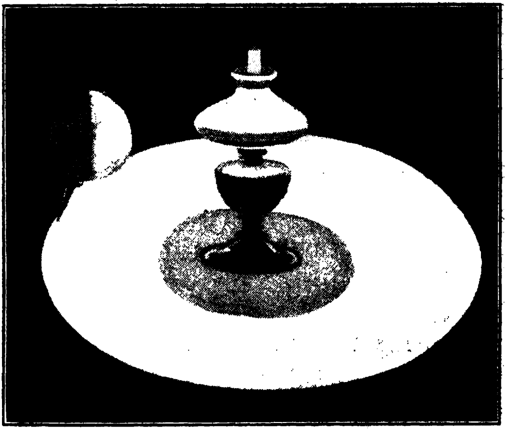
না দিয়া তাহার উপরকার মানুষ-গরু, ঘর-বাড়ী ও পাহাড়-পর্ব্বতকে বুকে লইয়া নিঃশব্দে লাটুর মত ঘুরিতেছে, কাজেই পৃথিবীর ঘোরা আমরা বুঝিতে পারি না। পথের ধারের গাছ-পালা স্থির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রেরা চলিতেছে কি না দেখিয়া, পৃথিবী চলিতেছে কি না বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে এবং রাত্রিতেও নক্ষত্রেরা দলে দলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপাকে লাটুর মত ঘুরিতেছে বলিয়াই, তাহাদিগকে আমরা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতেছি।

সূর্য্যের উদয় হইলে দিন হয় এবং তাহা অস্ত গেলেই রাত্রি হয়। কাজেই সূর্য্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ-কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। পৃথিবী লাটুর মত ঘুরপাক খায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহা এখন বুঝা যাইবে।

মনে করা যাউক, যেন টেবিলের উপরে একটা ল্যাম্প্ জ্বলিতেছে। এটা যেন আমাদের ছোট সূর্য্য। সূর্য্য যেমন আকাশের মাঝে দাঁড়াইয়া তাপ ও আলোক ছড়ায়, টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া ল্যাম্পও চারিদিকে সেই প্রকারে তাপ ও আলোক ছড়াইতেছে।

তার পরে মনে করা যাউক, এই ল্যাম্পেরই পাশে

একটা বড় রকমের লাট্টু, তার হুলের উপরে দাঁড়াইয়া বন্‌-বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। এই লাট্টু যেন আমাদের পৃথিবী। ইহারি উপরে যেন আমাদের ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সব



টেবিল-ল্যাম্প ও লাট্টু

দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত সকলি রহিয়াছে। লাট্টুও ঘুরপাক-খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কাজেই লাট্টুকে পৃথিবী বলিয়া মনে করা ভুল হইল না।

এখন ছবির দিকে একবার তাকাইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, লাট্টুর যে আধখানা ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে,

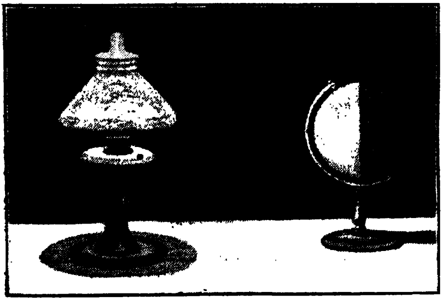
কেবল তাহাতেই আলো পড়িতেছে; পিছনের দিকটায় একেবারে অন্ধকার। লাট্টু যদি ক্রমাগত না ঘুরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে চিরদিন ধরিয়া উহার এক অংশের উপরেই আলো পড়িত। কিন্তু লাট্টু স্থির নাই; কাজেই যে আধখানায় এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে তাহাই পিছনে গিয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং যাহা পিছনের অন্ধকারে ছিল, তাহা ল্যাম্পের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হইতেছে।

এখন লাট্টুর আলোয় থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং অন্ধকারে যাওয়াকে রাত্রি বলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, লাট্টুর প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়া একটু পরেই রাত্রি হইতেছে। আমাদের পৃথিবী সত্যই একটা বড় লাট্টুর মত ঘুরপাক খাইতেছে এবং সূর্য্য মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড ল্যাম্পের মত আলো দিতেছে। কাজেই, পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকিত হইয়া যে, পরে অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় না কি? ঠিক এই-রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন চিরকাল ধরিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবী একবার ঘুরপাক দিতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জন্য আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা।

ছবিতে লাট্টু তাহার হুলের উপরে ঠিক্ সোজা হইয়া ঘুরিতেছে না। পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা হইয়া ঘুরে না। তোমাদের খেলার লাট্টু যেমন কখনো কখনো

ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে, পৃথিবী ঠিক সেই-রকমেই ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরপাক খায়। গ্রীষ্মকালের দিন যে কিরূপ দীর্ঘ এবং শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বাঁকিয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই, দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি হয়। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা তোমরা গল্পে শুনিয়াছ, তাহাও পৃথিবী ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে বলিয়া হয়।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতটা বাঁকিয়া থাকে, তোমাদের স্কুলের একটা গ্লোব্ দেখিলেই তাহা বুঝিবে। আমরা এখানে সেই গ্লোব্ লইয়াই দুখানা ছবি দিলাম।

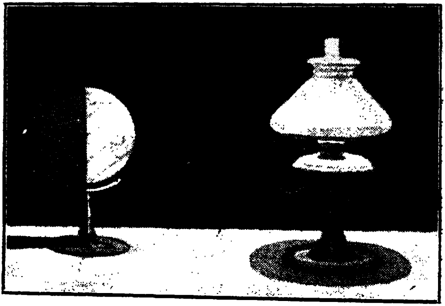


ল্যাম্প্ ও গ্লোব্—১ম চিত্র

প্রথম ছবিখানিতে একটি ল্যাম্প্ জ্বলিতেছে এবং

ল্যাম্পের পাশে গ্লোব্ রহিয়াছে। ল্যাম্প্ যেন সূর্য্য এবং গ্লোব্ যেন তোমাদের পৃথিবী।

গ্লোব্ পৃথিবীরই মত মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া আছে বলিয়া, ল্যাম্পের আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখন যদি তোমরা গ্লোব্‌টিকে বন্-বন্ করিয়া ঘুরাইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঘুরপাক খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরুপ্রদেশ কখনই অন্ধকারের মধ্যে যাইবে না। পৃথিবী যখন এই-রকম অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘুরপাক খায়, তখন তাহারো উত্তর মেরুতে রাত্রির অন্ধকার আসে না। এজন্য সেখানে বহুকাল রাত্রি হয় না।



ল্যাম্প্ ও গ্লোব্—২য় চিত্র

দ্বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, গ্লোবের উপর দিকের মেরুতে অন্ধকার আসিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী যখন এই-

রকম অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহারো উত্তর-মেরুতে অন্ধকার আসে। এই অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে আসিয়া পড়ে না। মেরু-প্রদেশে এই রকমে অনেক দিন ধরিয়া রাত্রিই চলে।

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, পৃথিবী ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-রাত্রির পরিমাণের এত কমিবেশি হয়। প্রতিবৎসরে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি যে-সব ঋতু পৃথিবীতে একে একে দেখা দেয়, তাহারাও কতকটা ঐ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়; তখনকার ছোট রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, কাজেই খুব গ্রীষ্ম হয়। ইহাই গ্রীষ্মকাল। যখন দিন ছোট হয়, তখন মাটি-পাথর গরম হইতে না হইতে রাত্রি আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভয়ানক ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। ইহাই শীতকাল। এই কারণ ছাড়া, ঋতু-পরিবর্ত্তনের আরো অনেক কারণ আছে। তোমরা যখন প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িবে, তখন সেগুলি বুঝিবে।

গ্রহ-উপগ্রহ

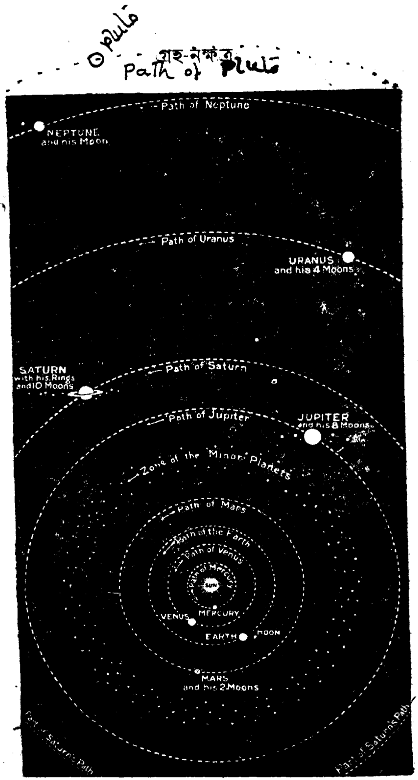
আমরা এপর্য্যন্ত কেবল পৃথিবীর কথাই বলিলাম। পৃথিবী ছাড়া আমাদের জানা-শুনা আর যে-সকল তারা আকাশে আছে, এখন একে একে তাহাদের কথা বলিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাট্টুর মত নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ছাড়া আরো সাতটি ছোট-বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্ব্বদা সূর্য্যের চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই যে, কাছাকাছি থাকিয়া সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা নয়। কেহ সূর্য্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে আছে; কেহ-বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একটা প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া ইহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সূর্য্য মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, ঘোরা বন্ধ রাখিয়া একটু দাঁড়ায়। চোখে ঠুলি-বাঁধা গরু যেমন ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, সূর্য্যের চারিদিকে সেই-রকম আটটা পৃথিবী দিবারাত্রি পাক খাইতেছে। ঘানীর বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। অবশ্য এই পৃথিবীগুলাকে সূর্য্য দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই; কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই দড়াদড়ির কাজ

করে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, সূর্য্যের আকর্ষণ না মানিয়া একটু এদিক্‌-ওদিকে যায়। চুম্বক যেমন লোহাকে টানিয়া রাখে, এই টান যেন সেই রকমের।

আমাদের পৃথিবী এবং আরো যে সাতটা তারা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদের এক-একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; তার পরে শুক্র এবং তার পরেই আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ এবং নেপ্‌চুন পর পর দূরে দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা হইলে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ এবং নেপ্‌চুন এই আটটিই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে না, কেবল এই আটটিই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্য জ্যোতিষীরা এগুলির একটা পৃথক্‌ নাম দিয়াছেন। ইঁহারা বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ সকলকেই গ্রহ বলিয়া থাকেন।

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু দেখা যায়, তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তারা। ইহাদের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। এরা নিজেরাই একটা একটা প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং তাহাদের রাজ্য সূর্য্যের রাজ্য হইতে



সৌরজগৎ—গ্রহগণের পথ

আমরা দেখিতে পাই, যেখানে দুটো রাস্তা কাটিয়া চলিয়াছে সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরাস্তা আছে, তাহার একটা রাস্তা ধরিয়া একটা গরুর গাড়ী এবং আর একটা রাস্তা ধরিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি একখানা গাড়ীর গাড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না থামায় বা পাশ কাটাইয়া গাড়ীখানিকে না চালায়, তাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়; গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগে!

পৃথিবীর পথ যদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া চলিত, তাহা হইলে ঠিক এই-রকম বিপদেরই সম্ভাবনা থাকিত। তখন হয় ত এমন দিন আসিত, যখন দুই পথের চৌমাথায় পৃথিবী, শুক্রের বা মঙ্গলের মুখোমুখী আসিয়া পড়িত এবং একটা অপরটাকে ধাক্কা দিয়া একবারে চুরমার হইত; ভগবান্ কোনো গ্রহের পথের উপরে অন্য গ্রহের পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহেরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ফেরার মধ্যে আর একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। কোনো গোলাকার পথে ঘুরিতে গেলে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে অথবা ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে ঘুরা যায়। ঘড়ির কাঁটা গোলাকার পথে দিবারাত্রি

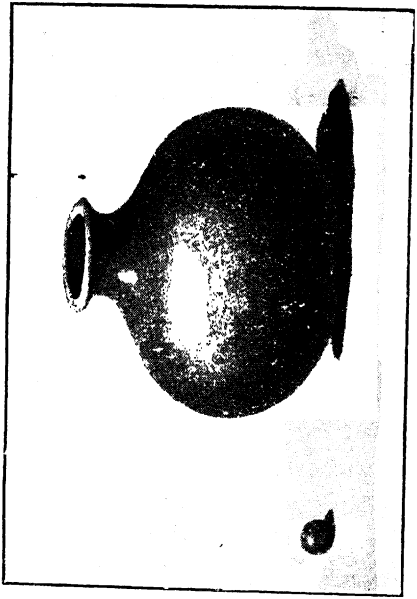
ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, দুটো কাঁটাই বাঁ-দিক হইতে ডান দিকে ঘুরিতেছে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি যে আটটি গ্রহ সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহারাও ঘড়ির কাঁটার মত একমুখো হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-সকল উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া একই পাকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় যে একবার ঘুরপাক খায়, অপর গ্রহেরাও এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ-রকম ঘুরপাক দেয়। ইহাদেরও ঘুরপাক দেওয়ার দিক্, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক।

ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহেরা যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে এটা কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? একই রাজার রাজ্যে যত আইন-কানুন থাকে সকলই এক হয়। এক প্রজার জন্য এক রকম আইন এবং আর প্রজার জন্য ঠিক তার উল্টা আইন, এমনটি কোনো রাজ্যেই দেখা যায় না। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া রাজভক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে তাহা জান কি?—সূর্য্যই সেই রাজা। অবশ্য রাজার রাজা জগদীশ্বর সকলের মাথার উপরে আছেন। কিন্তু যে রাজার অধীনে ইহারা প্রত্যক্ষভাবে চলা-ফেরা করে, তাহার শাসন

এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে একটুও এদিক্-ওদিক্ হইবার উপায় নাই।

সূর্য্যকে আমাদের এই জগতের রাজা বলিলাম। কিন্তু ইহাকে গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার সন্তানদের আকৃতি-প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা যায়। রাম ও যদু দুই ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন। যদি একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য কর, তবে তাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে। চুলের রঙ্, গায়ের রঙ্, চোখের তারার রঙ্, হাসি-কান্না এবং চলাফেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে।

কাজেই দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহারা একই পিতার সন্তান বা একই পরিবারের লোক। গ্রহ-উপগ্রহদেরও চাল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সন্তান। সূর্য্যই এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের চাঁদগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? আমরা পরে এ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব।



সূর্য্যকে একটা জালার মত যদি ধরা যায়, তবে পৃথিবীকে একটা মটরের মত দেখাইবে

সূর্য্য

একা সূর্য্য মাঝে দাঁড়াইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি ছোট-বড় আটটি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সূর্য্য কম জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাহাকে টানিয়া শাসনে রাখা সহজ। কিন্তু দুই শত আশী কোটি মাইল তফাতে, নেপ্‌চুন্ নামে যে গ্রহটি রহিয়াছে, তাহাকেও টানিয়া ঘুরাইতে থাকা বড় কম কথা নয়।

সত্যই সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী যে কত বড় তোমরা তাহা জান। সেই-রকম তেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে তবে সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করা যায়। মনে কর, কুমারের দোকানে ফর্‌মাইস্ দিয়া একটা মাটির জালা তৈয়ার করানো গেল। ইহার ভিতরকার ফাঁক সব জায়-গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই জালাকে সূর্য্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী হইয়া দাঁড়ায় একটা ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত মটর রাখা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের ডালে তোমাদের বাড়ীর চার পাঁচটি লোকের এক বৎসরের খাওয়াই চলিয়া যাইবে। সূর্য্য যদি একটা বড় জালা হয়, তবে আমাদের পৃথিবী হয় একটা ছোট মটর। এখন ভাবিয়া দেখ, সূর্য্য কত বড়।

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী যতই বড় হউক, তাহাকে ঘুরিয়া আসা আজকাল শক্ত নয়। কলিকাতা হইতে জাহাজে বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর পার হওয়া গেল; তার পরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া ও ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডের কাছে এট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় পৌঁছানো গেল। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনেকেই আজকাল এই-রকমে ভ্রমণ করেন। অবশ্য জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশি লাগে। মনে কর, পৃথিবী ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাকগাড়ীতে চাপিয়াছি। গাড়ী কোনো ষ্টেশনে না থামিয়া যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দিবারাত্রি হু হু করিয়া চলিয়াছে। এ-রকমে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি? আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিন সপ্তাহের অর্থাৎ একুশ দিনের বেশি সময় লাগে না।

এখন মনে কর, যেন আমাদের সূর্য্যকে ঘিরিয়াও ঐ-রকম একটা রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন তাহারি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছি। গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া হু হু করিয়া অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল। আমরা কত দিনে সূর্য্যের উপরে একবার বেড় দিয়া চলিয়া

আসিব বলিতে পার কি ? আমরা ইহারো একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। গাড়ীখানা ঠিক সাত বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি না চলিলে সূর্য্যকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমাদের সাত বৎসরের খাবার ও কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ীর পিছনের একখানি মালগাড়ীতে বোঝাই দিয়া তবে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে একুশ দিন লাগে, আর সূর্য্যের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে সাত বৎসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং সূর্য্য কত বড়!

আমরা কিন্তু এত বড় সূর্য্যকেও পৃথিবী হইতে একখানি রেকাবির মত দেখি। কাজেই বুঝা যাইতেছে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে। অনেক দূর হইতে দেখিলে, সব জিনিসকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘুঁড়িতে শক্ত সূতা বাঁধিয়া যখন উড়ানো যায়, তখন সেটি কত ছোট দেখায় দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় তাহা যেন তোমার এই বইখানিরই মত ছোট। কিন্তু নীচে নামাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঘুঁড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, সূর্য্য যে অনেক দূরে আছে, তাহা উহার রেকাবির মত ছোট আকারটি দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দূরে না থাকিলে, এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ?

যাহা হউক, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মোটামুটি হিসাবে

এই দূরত্বের পরিমাণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে বুঝিলে কি ? এক শতের দশ গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক লক্ষ হয় এবং এক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয়। আমাদের কাছ হইতে সূর্য্য এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। এবার বুঝিলে কি ?—বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে আমরা দুই মাইল, চার মাইল, না হয় হাজার মাইল লইয়া হিসাব করি। এখান হইতে ইংলণ্ড মোটে দশ হাজার মাইল দূরে, তাই শুনিয়াই আমরা মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি আর নাই। কাজেই নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল যে কত দূর, আমরা তাহা কল্পনাই করিতে পারি না।

আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়া সূর্য্যের দূরত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আগেকার মত মনে কর, যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা রেলের লাইন শূন্যের উপর দিয়া আকাশ ভেদ করিয়া সূর্য্যে পৌঁছিয়াছে এবং এই লাইনে যেন একটা গাড়ী সূর্য্যে পৌঁছিবার জন্য ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে দিবা-রাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিয়াছে। কত দিনে ইহা সূর্য্যে গিয়া পৌঁছিবে, এখন বলিতে পার কি ?—আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই-রকমে সূর্য্যে পৌঁছিতে গেলে তিনশত পঞ্চাশ বৎসর রেলের গাড়ীতে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই দিন যাত্রা সুরু করিলে গাড়ীখানা

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের দিল্লীতে অভিষেকের পূর্ব্বে কখনই সূর্য্যে পৌঁছিতে পারিবে না। কি ভয়ানক দূরত্ব!

কিন্তু এত দূরে থাকিয়াও ত সূর্য্যের তেজ কম নয়! চৈত্র-বৈশাখ মাসে সূর্য্যের তেজের কথা মনে কর দেখি;—সূর্য্য যেন তখন আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার আলোই বা কত!

চাঁদকে আমরা দূর হইতে সূর্য্যের মতই বড় দেখি, কিন্তু চাঁদ ত এত আলো দেয় না এবং তার কিরণও ত গরম নয়। এই সব দেখিলে মনে হয় না কি যে সূর্য্যটা আগুন দিয়া গড়া।

সত্যই সূর্য্যকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন সূর্য্য-লোকে জ্বলিতেছে। তাহারি তাপ আমরা এত দূরে পৃথিবীতে থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় বলিয়া, আমরা পথ ঘাট মাঠ দেখিয়া চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়া দেখ, সেই প্রকাণ্ড সূর্য্যকে ঘিরিয়া কি আগুনই জ্বলিতেছে! আমাদের রান্নাঘরের উনুনে যখন আগুন জ্বলে, তখন তাহার তাপ হয় ত দু-হাত কি দশ হাত তফাৎ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি কোটি মাইল দূরের তাপ যখন আমাদের কাছে এত অধিক বলিয়া বোধ হয়, তখন সূর্য্যের উপরকার সেই তাপ কত বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

কিছু না জ্বলিলে আগুন হয় না। উনুনে কাঠ প্রভৃতি

পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু কয়লা ও নানা রকম গ্যাস্ জ্বলিয়া লাল হয়, তাই উননের কাঠ বা কয়লা আলো ও তাপ দেয়। বিদ্যুতের ল্যাম্পের ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ গেলেই সেটা গরম হয় এবং সেই গরমে তাহা লাল হইয়া বা সাদা হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহাতেই আমরা বিদ্যুতের ল্যাম্প্ হইতে আলো পাই এবং তাহার কাছে হাত রাখিলে তাপ নাই।

ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সূর্য্যে কি জ্বলিতেছে বলিতে পার কি?—জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি পাথর বালি কাঁকর আছে, সূর্য্যে তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাষ্প; এই বাষ্পই জ্বলিয়া এত তাপ ও আলোক দেয়। সমস্ত সূর্য্যটা এই-রকম বাষ্প দিয়া প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নয়। সূর্য্য যে বাষ্প দিয়া প্রস্তুত, তাহা আনিয়া যদি একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ওজন কর এবং তার পরে সেই হাঁড়ি খালি করিয়া তাহাতে আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়া ওজন কর, তাহা হইলে দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সূর্য্যের বাষ্পের ওজনের প্রায় চারিগুণ বেশি হইয়াছে। সূর্য্য দূরে থাকিয়া এত জাঁক-জমক দেখাইলেও, তাহার দেহটা খুব হাল্কা!

সূর্য্যের দেহ জ্বলন্ত বাষ্প দিয়া গড়া, কিন্তু তাই বলিয়া যেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস যেমন বাষ্প, সেই-রকম বাষ্প দিয়া সূর্য্যের শরীরখানি গড়া হইয়াছে। বাষ্পকে ছোট পাত্রে আট্‌কাইয়া চাপ দিলে তাহা আকারে ছোট হইয়া যেমন খুব ঘন হয়, সূর্য্যের গোলাকার যে অংশটাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, তাহা ঐ-রকম ঘন বা তরল বাষ্প দিয়াই প্রস্তুত। মাটি পাথর বালি কাঁকর জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীকে যেমন একটা গোলাকার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, খুব ঘন জ্বলন্ত বাষ্প একত্র হইয়া সেই-রকমে সূর্য্যকে একটা ভয়ানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়া গড়িয়াছে।

কেবল মাটি পাথর বালি ও কাঁকর লইয়াই পৃথিবী নয়, পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাতাস আছে। ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ইহা পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জোরে নিজের চারিদিকে টানিয়া রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাস পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের বাতাসকে কখনই পৃথিবী-ছাড়া জিনিস বলা যায় না।

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের জানা আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ; কাঠ পাথর ইট্ প্রভৃতি জিনিস যেমন আমাদের দৃষ্টি আট্‌কাইয়া দেয়, বাতাস সে-রকমে দৃষ্টি আট্‌কায় না। কাঠের ভিতর

দিয়া বা ইটের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনো জিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিতর দিয়া সব জিনিসই দেখিতে পাই। এই জন্যই চন্দ্রসূর্য্যের আলো ও নক্ষত্রদের আলো পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস লইয়াই আমাদের বায়ুমণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ আছে। মেঘ জিনিসটা বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। তাই মেঘ উঠিলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পড়িয়া যায়। তার পরে আবার সেই মেঘে বৃষ্টি হয়; বাতাস ছুটাছুটি করিয়া ঝড় তোলে। সূর্য্যের চারিদিকেও আমাদের বায়ুমণ্ডলের মত বাষ্পের আবরণ আছে। কিন্তু পৃথিবীকে ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সূর্য্যকে ঘিরিয়া সেই-রকম তিনটা আবরণ আছে। এই তিনটা লইয়াই সূর্য্যের আকাশ। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের মত জ্বলে না, ইহার উপরটা বেশ ঠাণ্ডা এইজন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও ঠাণ্ডা। কিন্তু সূর্য্য দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, এইজন্য ইহার বাষ্পের তিনটা আবরণও জ্বলিয়া-পুড়িয়া সর্ব্বদা তাপ ও আলোক দিতেছে।

দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণটা স্পষ্ট দেখা যায়। পৃথিবীর বাষ্প-আবরণকে আমরা যেমন বায়ুমণ্ডল বলি, জ্যোতিষীরা সূর্য্যের এই প্রথম বাষ্প-আবরণকে আলোক-মণ্ডল (Photosphere) বলেন। সূর্য্যের যত আলো এই আলোক-মণ্ডল হইতে আসিয়া আমাদের

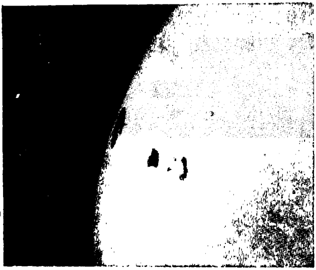
কাছে পৌঁছায়। আমাদের নদী-সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ উৎপন্ন করে, জ্যোতিষীরা বলেন, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল ঐ মেঘেরই মত কিছু। সূর্য্যের দেহের জ্বলন্ত বাষ্প উপরে উঠিয়া একটু ঘন হইয়া গেলে আলোক-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয় না এবং তাপও দেয় না, সূর্য্যের আকাশের মেঘ সে-রকম নয়। উহা সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে এবং খুব তাপ দেয়। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে যে মেঘের মত জিনিসই অধিক আছে, দূরবীণ দিয়া দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দূরবীণে আলোক-মণ্ডলের সকল অংশকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। ড্রইং কাগজকে যেমন দানা-দানা উঁচু-নীচু দেখায় সূর্য্যের আলেক-মণ্ডলকে দেখিতে কতকটা সেই-রকম; জ্বলন্ত মেঘগুলি সূর্য্যের আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া ঐ-রকম উজ্জ্বল দানাগুলির সৃষ্টি করে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উল্টাইয়া যায়, কত বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরো দিন, কুড়ি দিন, কখনো কখনো এক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। আগুনের মত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি এই-রকমে আলোড়িত হইয়া সূর্য্য-লোকে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ।

সূর্য্যের কলঙ্ক

চাঁদের কলঙ্ক আছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। চাঁদের উপরে ঐ কলঙ্কের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, চাঁদে এক বুড়ি আছে, সে সেখানে এক কদম-তলায় বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতেছে। কেহ বলে, চাঁদ এক সময়ে নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোস চুরি করিয়াছিল এবং এই পাপের জন্য তার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা চিরদিনের জন্য আঁকা আছে। এ-সব গল্প কখনই সত্য নয়। চাঁদের গায়ের দাগগুলি যে কি, তাহা তোমাদের পরে বলিব। কিন্তু তোমাদের বোধ হয় জানা নাই যে, চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যেরও কলঙ্ক আছে। চাঁদের কলঙ্ক যেমন চির-



সূর্য্যের কলঙ্ক

দিনের মত তাহার গায়ে লাগানো থাকে, সূর্য্যের কলঙ্ক অবশ্য সে-রকম থাকে না। দু'দিন দশদিন বা মাসখানেক ধরিয়া

সূর্য্যের গায়ে এগুলি কালো কালো দাগের মত দেখা দেয় এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। এগুলি বড় মজার জিনিস। যদি ছোটখাটো দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে দেখার সুবিধা পাও, তবে একবার সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া লইয়ো। সূর্য্যের কোনো-না-কোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় সকল সময়েই দেখা যায়।

কি-রকমে এই সকল কলঙ্কের সৃষ্টি হয়, এখন দেখা যাউক।

আমাদের আকাশ এক-এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সে-সময়ে যদি একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি ?—ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন হয় ত মেঘের ফাঁক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং মেঘেরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে।

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে; মনে কর, এমন সময়ে তুমি একটা ব্যোমযান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ?—তোমার এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত আছে, তাহা তোমার নজরেই পড়িবে না; কারণ, এরোপ্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা তোমার দৃষ্টি আট্‌কাইয়া দিবে। মনে কর, একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া যেন

নীচেকার মেঘের কতক অংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি মেঘের এই ফাঁক দিয়া নিশ্চয় নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল সব দেখিতে পাইবে। এরোপ্লেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা দেখিয়াছিলে, কতক কতক মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক-একটা গর্ত্ত হইয়া পড়িবে এবং এই গর্ত্তের ভিতর দিয়া পৃথিবীর উপরকার গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। সূর্য্যের দেহে যে কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা সম্ভবত এই-রকম ঝড়েই জন্মে বলিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন।

সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলটা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া নানা-রকম বাষ্প ইহাতে জ্বলে এবং পোড়ে। কাজেই জ্বলন্ত বাষ্প ভয়ানক বেগে ছুটাছুটি করিয়া এবং ধাক্কাধাক্কি দিয়া সূর্য্যে প্রায়ই ঝড় উঠায়। ঝড় ছোটখাটো হইলে আমরা এতদূরে থাকিয়া তাহার সন্ধানই করিতে পারি না, কিন্তু যখন বড় ঝড় উঠে, তখন আমরা তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বসিয়া-বসিয়াই পাইতে থাকি। তখন ঝড়ের জোরে সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলের জ্বলন্ত বাষ্প স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়; কাজেই সেই সকল জায়গার ফাঁকে উহার আসল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে থাকে। তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোক-মণ্ডলের তাপ ও আলোই সূর্য্যকে এত উজ্জ্বল ও গরম করিয়াছে। যে ঘন বাষ্প বা তরল দ্রব্য দিয়া সূর্য্যের আসল দেহটা নির্ম্মিত,

তাহা খুব উজ্জ্বল নয় এবং গরমও নয়। এই জন্যই অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলের ফাঁক দিয়া সূর্য্যের দেহটা কালো দেখায়।

ঝড়ের সময়ে আলোক-মণ্ডলের উজ্জ্বল বাষ্প সরিয়া গিয়া এই-রকমে যে কালো কালো গর্ত্ত উৎপন্ন করে, সেই-গুলিকেই আমরা দূর হইতে সূর্য্যের কলঙ্কের আকারে দেখি। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ঝড় উঠিলে, তাহা হয়ত দু'ঘণ্টা চার ঘণ্টা, না হয় এক দিন দুই দিন থাকে। কিন্তু সূর্য্য যেমন প্রকাণ্ড জিনিস, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড। একবার ঝড় উঠিলে তাহা পনেরো কুড়ি দিনের কমে থামে না। কখনো কখনো থামিতে একমাসের উপরেও সময় লয়। কাজেই ঝড়ে সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে যে গর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাও ঐ-রকম একমাস-পর্য্যন্ত থাকে। একবার একটা ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় মাস পর্য্যন্ত ছিল। এই কারণে সূর্য্যের উপরে একবার কলঙ্ক দেখা দিলে, তাহা খুব শীঘ্র মুছিয়া যায় না। এ-গুলির আকারও বড় কম নয়; কখনো কখনো ইহা এত বড় হয় যে, খালি-চোখেও দেখা যায়। আমরা প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এই-রকম একটা বড় কলঙ্ককে দূরবীণ না দিয়া কেবল কালী-মাখানো কাচের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলাম। সেই গর্ত্তটা এত বড় ছিল যে, হাজারটা পৃথিবী তাহার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত!

ঝড়ের জোরে আলোক-মণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেই

যে কলঙ্ক জন্মে, কলঙ্কের ছবিটা ভাল করিয়া দেখিলেই তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবে।



সূর্য্যের একটা খুব বড় কলঙ্ক

সূর্য্যের কলঙ্ক কি-রকমে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার আলোক-মণ্ডলসম্বন্ধে অনেক কথা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, জল ফুটাইলে তাহাতে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ উঠে, সূর্য্যের ভিতরকার আসল দেহটা ফুটিয়া সেই-রকম বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন করে। দূর হইতে এইগুলিকেই আমরা সূর্য্যের কলঙ্ক বলিয়া মনে করি।

সূর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিষীরা যে-রকমে সূর্য্যের গতি আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী লাট্টুর মত নিজে নিজে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায় এবং ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। সূর্য্য এ-রকমে লাট্টুর মত ঘুরে কি না, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন সূর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়াই ইহারো ঘুরপাক খাওয়ার কথা জানা গিয়াছে।

এক-রঙা গোল জিনিসের গায়ে যদি কোনো দাগ না থাকে, তবে খুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে কি না দূর হইতে বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দূরে একটা সাদারঙ-করা ফুট্‌বলের মত বড় লাট্টু ঘুরিতেছে; ইহা ঘুরিতেছে কি না, তুমি দূর হইতে বুঝিতে পারিবে কি? মনে হইবে, যেন সাদা ফুট্‌বল্‌টি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াই আছে। কিন্তু ঐ সাদা ফুট্‌বলে যদি একটা বড় রকমের কালো দাগ থাকে এবং বল্‌ যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহা হইলে সেই কালো দাগ একবার তোমার সম্মুখে আসিয়া আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ফুট্‌বল ঘুরিতেছে। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে যে কলঙ্ক দেখা দেয়, তাহা ঐ ফুট্‌বলের কালো দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে

সূর্য্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং আবার সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়।

ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, পৃথিবী যেমন তাহার অক্ষরেখার উপরে দাঁড়াইয়া লাট্টুর মত ঘুরপাক খায়, সূর্য্যও ঠিক সেই-রকমে ঘুরপাক খায়। তাহা না হইলে উহার কলঙ্কগুলি কখনই সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে পিছনে লুকাইত না। কেবল ইহাই নয়, এক একটা কলঙ্ক সূর্য্যের সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিতে যে সাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাও ঠিক করা হইয়াছে। কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়, সূর্য্য তেমনি সাতাইশ দিনে একটা ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ পৃথিবী সূর্য্যের চেয়ে খুব জোরে জোরে পাক খায়।

সূর্য্যের গ্রহণ

সূর্য্যের আকাশের আরো দুইটা আবরণ আছে। তাহাদের কথা এখনো বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্ব্বে সূর্য্যের গ্রহণের কথা তোমাদিগকে বলিয়া লইব।

তোমরা অবশ্যই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের সময়ে কত দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া গঙ্গায় স্নান করে, আহ্নিক-পূজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখা থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্য প্রতীক্ষা করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যায়, একটু একটু করিয়া সূর্য্যের দেহটা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, সূর্য্যের গ্রহণ দেখিতাম। সূর্য্য এত উজ্জ্বল যে, খালি চোখে তার দিকে তাকানো যায় না, তাকাইলেও চোখ খারাপ হয়। কালী-লাগানো কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে সূর্য্যের অনেকটা আলো কাচে আট্‌কাইয়া যায়; তখন তাহাকে ঠিক চাঁদখানির মত দেখা গিয়া থাকে। দূরবীণ দিয়া দেখিবার সময়েও এই-রকম কালী-মাখানো কাচ দিয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয়।

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ পাইতাম; তখন একটু-একটু ভয়ও হইত। কোথায় কিছু

নাই, দিন-দুপরে সূর্য্য এমন ক্ষয় পাইয়া যায় কেন, এই কথাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, দুপর ঠিক বিকালের মত অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে, পাখীরা বাসায় যাইবার জন্য চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়াছে, চারিদিকের কাঁসর-ঘণ্টা ও খোল-করতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, তখন আরো ভয় হইত। প্রায় কুড়ি বৎসর আগে আমরা একটা খুব বড় সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছিলাম। বেলা দুইটা তিনটার সময়ে সেদিন সূর্য্য এত ঢাকা পড়িয়াছিল যে, ঠিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে-সময়ে আকাশে দুই-চারিটা নক্ষত্রও দেখা গিয়াছিল। এই ভারতবর্ষের কতক কতক স্থানে সে-সময়ে সূর্য্য একেবারে ঢাকা পড়িয়াগিয়াছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় বড় জ্যোতিষীরা নানা রকম যন্ত্র লইয়া এই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

সূর্য্যের কেবল কতকটাই ক্ষয় পাইয়া গেল, এ-রকম আংশিক গ্রহণ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ একটু একটু ক্ষয় পাইয়া দিনে রাত হইয়া গেল, এ-রকম গ্রহণ খুব অল্পই হয়; তার পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ দু'মিনিট তিন মিনিটের অধিক থাকে না। এজন্য এই-রকম গ্রহণের সময় দূর দেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতেরা অনেক রকম যন্ত্র দিয়া গ্রহণ দেখিবার আয়োজন করেন। গ্রহণের সময় সূর্য্যের

আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায়। এই জন্যই এত আয়োজন তার কথা আমরা তোমাদিগকে পরে বলিব।

সূর্য্য-গ্রহণ কি-রকমে হয় জান কি ? লোকে এ-সম্বন্ধে কত কথাই বলে! কেহ বলে, রাহু নামে এক দৈত্য সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে ; কেহ বলে, সূর্য্যের ক্ষয় রোগ আছে, তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসে। এ-সকলই মিথ্যা গল্প ; কিন্তু অতি প্রাচীনকালে লোকদের এই সব অদ্ভুত মিথ্যা গল্প সত্য বলিয়া বোধ হইত। ঠিক কি-রকমে সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তখনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত না।

একটা মজার গল্প বলি শুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিথ্যা হয়, কিন্তু এটা সত্য গল্প। তোমরা কলম্বস্ সাহেবের নাম শুনিয়াছ ; ইনি স্পেন্ দেশের লোক ছিলেন। আমেরিকা বলিয়া যে একটা মহাদেশ আছে, কলম্বসের সময়ে তাহা কেহই জানিত না। কলম্বস্ সাহেবই জাহাজে করিয়া গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বস্ আমেরিকায় গিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু সে দেশের লোকদের সঙ্গে তাঁর চেনা-শুনা ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না। মাথায় পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উল্কি-পরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা কলম্বস্ ও তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষা চাল-চলন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু ভয়ও হইল। কলম্বস্ আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা কাহারো অনিষ্ট করিতে আসেন নাই, কিছু খাবার

জিনিসের প্রয়োজন। সেই অসভ্য জাতির সর্দারদের একটা সভা বসিয়া গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে কলম্বস্ দেখিলেন, তাহারা কিছু খাবার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাছে রাখিয়া গেল। খাবার ফুরাইয়া গিয়াছিল, এজন্য তাঁহারা বড় চিন্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়া গেল, কলম্বস্ আবার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভ্য আমেরিকান্‌দের অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে তাঁহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। ক্ষুধা ও পিপাসায় কলম্বসের দলের সকল লোকই অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময়ে কলম্বসের মনে হঠাৎ একটা মতলব দেখা দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, সেদিন সূর্য্য-গ্রহণ হইবে। সূর্য্য-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অসভ্যেরা ভয় করে, একথা তাঁহার জানা ছিল। সূর্য্য-গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হইতে কিছু খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন।

মতলব ঠিক হইয়া গেল। সর্দারদের ডাকিয়া কলম্বস্ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন,—"দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, তোমরা যদি আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ ত্বপুরে সূর্য্যকে নিভাইয়া দিব; তোমাদের এই দেশটা চিরদিন অন্ধকার থাকিবে।"

সর্দ্দারেরা এ-কথা বিশ্বাস করিল না। কলম্বস্ এক গাছতলায় বসিয়া সূর্য্য-গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক সময়ে গ্রহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়া সূর্য্যের অর্দ্ধেকটা কালো হইয়া গেল; সূর্য্যের আলো কমিয়া আসিল।

এদিকে অসভ্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; তাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকেরা সত্যই দেবতার বংশধর। তাহারা খাবার না পাইয়া রাগ করিয়া সূর্য্যকে নিভাইয়া দিতেছে। অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া কলম্বসের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং নানা-রকম খাবার ভারে ভারে আনিয়া তাঁহার গাছতলায় জমা করিতে লাগিল।

কলম্বস্ খুব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, ছয় মাসের মত খাবার মজুত হইয়াছে, তখন তিনি সর্দ্দারদের ডাকিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, সন্তুষ্ট হইয়াছি, সূর্য্যকে আবার আলো দিতে বলিলাম।"

তখন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, দেবতার বংশধর কলম্বসের কথা সত্য হইল; একটু-একটু করিয়া সূর্য্য আবার পূর্ব্বের মত পূর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে কলম্বসের দলের লোকের আর খাদ্যের অভাব হয় নাই।

এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুব সভ্য দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের কথা ভাল করিয়া জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এসব খুব জানিতেন; তাঁহাদের পূজা আহ্নিক হোম জপতপ সকলি গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের গতিবিধি-অনুসারে করিতে হইত। তাঁহারা গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্তের সময় এবং কোন্ দিন কখন্ চন্দ্র-সূর্য্য আকাশের কোন্ অংশে থাকিবে, এ-সবও হিসাব করিতে পারিতেন। সে-সময়ে দূরবীণ ছিল না, হিসাব করিবার মত অন্য যন্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কি-রকমে এই-সব হিসাব-পত্র করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক, আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্য-জাতি আছে, যাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ভয়ে ভয়ে দেখিয়া মনে করে, বুঝি কোনো দৈত্য-দানবেই চন্দ্রসূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

আচ্ছা, সূর্য্য-গ্রহণ কি-রকমে হয় তোমরা বলিতে পার কি? গ্রহণের সময়ে সূর্য্য যে ঢাকা পড়িয়া যায় এ-কথা ঠিক, কিন্তু কে সূর্য্যকে ঢাকে এবং কি-রকমে ঢাকে, এ-সব কথা তোমরা জান কি? যেমন ছাতা দিয়া আমরা সূর্য্যকে ঢাকি বা হাতের তেলো দিয়া সূর্য্যের আলো রোধ করি, ইহা যেন সেই-রকমেরই ঢাকা-পড়া। একখানা কালো মেঘ ভাসিয়া আসিয়া কি-রকমে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে, বা তাহার

আধখানা ঢাকিয়া রাখে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই-রকমে সূর্য্য ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে না, চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সত্যই, এই-রকমে কিছু দিয়া ঢাকা পড়িলে সূর্য্যের গ্রহণ হয়। আকাশের অত উঁচু জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না, মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে ; কারণ সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে মেঘ দেখা যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাও মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। কাজেই মানিয়া লইতে হয়, আকাশের উঁচু জায়গায় কোনো একটা বড় জিনিষ ধীরে ধীরে আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। কিন্তু জিনিষটা কি ?

তোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনো প্রকাণ্ড জিনিস সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরাও তোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়াছিলেন। কেবল ভাবিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, বারবার সূর্য্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অঙ্ক কষিয়া হিসাব-পত্র করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের চাঁদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

তোমরা ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলায় কোথা হইতে চাঁদ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিবে ! কিন্তু তোমরা

যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে দিনের বেলায় চাঁদ আকাশে থাকে। অমাবস্যার কাছাকাছি অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী দ্বাদশীতে চাঁদের কখন্ উদয় হয় দেখিয়াছ কি? তখন শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠে, তখন তোমরা ঘুমাইয়া থাক। এই সময়ে চাঁদ পূর্ব্ব দিকের আকাশের একটু উপরে উঠিলেই সূর্য্যের উদয় হয়। সূর্য্য উদিত হইলে তাহার আলোতে চাঁদকে দেখা যায় না—কিন্তু চাঁদ আকাশেই থাকে। সূর্য্যের একটু আগে আগে চলিয়া সে সূর্য্যাস্তের আগেই অস্ত যায়, কাজেই সন্ধ্যার পরে তাহাকে দেখা যায় না।

অমাবস্যার দু'দিন আগে চাঁদ কখন্ উঠে জান কি? তখন খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্ব্ব-আকাশের একটু উপরে উঠিতে-না-উঠিতে সূর্য্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের আলোতে আর চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু চাঁদ সমস্ত দিন আকাশেই থাকে এবং সূর্য্যের আলোতে ডুব সাঁতার কাটিয়া সূর্য্য অস্ত যাইবার একটু আগে অস্ত যায়। কাজেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না।

অমাবস্যার দিন চাঁদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি? তোমরা যদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া থাক, তাহা হইলেও একটুখানির জন্য চাঁদকে দেখিতে পাইবে না। সেদিন চাঁদের উদয় হয় সূর্য্যের সঙ্গে

সঙ্গে। সূর্য্যের আলো বেশি, তাই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই ; চাঁদ যে তাহারি কাছে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, ইহা আমরা দেখিতেই পাই না। তার পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির মধ্যে চাঁদকে কি করিয়া দেখিবে ?

সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পৃথিবীর কোলের কাছে থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্য্যের চেয়ে চাঁদই পৃথিবীর নিকটে আছে। অমাবস্যার দিন চাঁদ সূর্য্যের খুব কাছাকাছি থাকিয়া উদিত হয় এবং উহা আলোর মধ্যে লুকাইয়া সূর্য্যের পাশা-পাশি থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। এখন যদি সেদিন চাঁদ সূর্য্যের কাছে যাইতে যাইতে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পার কি ? তখন আমরা সূর্য্যের ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না ; সূর্য্যটা আধখানা বা সিকিখানা হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে চাঁদ যদি সমস্ত সূর্য্যটাকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে সূর্য্যের সকলি ঢাকা পড়িয়া যায়, দিনের আলো কমিয়া যায়, সূর্য্যের উজ্জ্বল অংশটাকে ঘোর কালো দেখায়। ইহাই সূর্য্যের পূর্ণ-গ্রহণ।

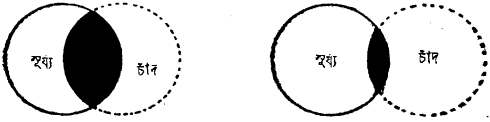
সূর্য্য-গ্রহণের দিন তোমরা যদি পাঁজি খুলিয়া দেখ, তাহা হইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্যা তিথি লেখা আছে দেখিবে। কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি ? কারণ অবাবস্যার

দিনই সূর্য্যের ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে আসিয়া চাঁদ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। এই দিনই একটু এ-পাশে বা ও-পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেই চাঁদ সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে। অন্য তিথিতে চাঁদ সূর্য্য হইতে এত দূরে থাকে যে, সে কখনই পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহাই যদি হয়, তবে সব অমাবস্যায় কেন সূর্য্য-গ্রহণ হয় না? এ-কথার উত্তর এই যে, সব অমাবস্যায় চাঁদ সূর্য্যের কাছে থাকিয়া উদয় ও অস্ত যায় বটে, কিন্তু পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় না। কাজেই চাঁদে সূর্য্য ঢাকা পড়ে না। দুপর বেলায় তোমরা ছাতাটিকে যদি সূর্য্য ও তোমার দেহের ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই সূর্য্যকে আড়াল দেওয়া যায় এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না। যে অমাবস্যায় আমাদের চাঁদখানি দিনের আলোর মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি আসিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই দিনই কেবল সূর্য্য-গ্রহণ হয়।

কতক অমাবস্যায় চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসে এবং কতক অমাবস্যায় আসে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের তাহা বলিব না। তোমরা যখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

এখানে সূর্য্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম।



১ম ছবি ২য় ছবি

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা সূর্য্যের অনেকটা কালো-কালো জিনিসে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝিবে, চাঁদ পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসিয়া সূর্য্যের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে সূর্য্যের আলো আট্‌কাইয়া গিয়াছে; তাই গ্রহণ হইয়াছে।

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পূর্ণ গ্রহণের ছবি। দেখ, চাঁদ মাঝে দাঁড়াইয়া এত উজ্জ্বল সূর্য্যটাকে কি-রকম কালো করিয়া ফেলিয়াছে।

এ-রকম পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত বয়স হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই-রকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের বাঙ্‌লা দেশ হইতে পূর্ণ-গ্রহণ দেখা যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরা জিলা-প্রভৃতি জায়গা

হইতে সূর্য্যকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স্, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় বড় দূরবীণ খাটাইয়া ও নানা যন্ত্র দিয়া পূর্ণ-গ্রহণের সময়কার সূর্য্যের ফোটোগ্রাফ ছবি তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষাকালে এ-রকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাঁহারা আসিতেন না, কারণ গ্রহণের সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্য ঢাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা হইত না। সব প্রস্তুত, যন্ত্র-পাতি খাটাইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল, এ-রকম ঘটনা পূর্ব্বে অনেক ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে কত কষ্ট হয় ভাবিয়া দেখ। তোমরা কলিকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল, তোমাদের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কষ্ট হয় বল দেখি। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ কত সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার হইয়া কত টাকা খরচ করিয়া, জাহাজে চড়িয়া তাঁহারা আসেন।

গ্রহণের সময়ে দু' মিনিটের জন্য সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, পাখীরা বাসায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময়ে যেমন তেঁতুল, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বুঁজিয়া আসে, সেই-রকমে

গাছের পাতা বুঁজিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ এই-রকমে দুপরে সন্ধ্যা দেখিবার জন্যই কি এত খরচ-পত্র করিয়া দূরদেশে আসেন ? কিন্তু তাহা নয়।

আগেই তোমাদের বলিয়াছি, সূর্য্যের উপরে তিনটা বাষ্প-মণ্ডল পর-পর সাজানো আছে। প্রথমটাকে অর্থাৎ যেটা সূর্য্যের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক-মণ্ডল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে দু'টা বাষ্প-আবরণ আছে আমরা তাহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল নাম দিলাম। আলোক-মণ্ডলকে খালি চোখে বা দূরবীণ দিয়া বেশ দেখা যায়; কিন্তু বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডলকে দূরবীণ দিয়াও দেখা মুস্কিল। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলের আলো সূর্য্যকে সর্ব্বদাই এমনি উজ্জ্বল করিয়া রাখে যে, কোন্‌টা আলোকমণ্ডল, কোন্‌টা বর্ণমণ্ডল এবং কোন্‌টাই বা ছটামণ্ডল, তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। তবে এগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় কি ? এই উপায়টা জ্যোতিষীরা সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল দুই চারি মিনিটের জন্য পাইয়া থাকেন। গ্রহণের সময়ে সূর্য্যকে ও তাহার গায়ের আলোক-মণ্ডলকে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল উহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এই দুইটি দেখিয়া তাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্যই এত কষ্ট করিয়া জ্যোতিষীরা সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্য বাহির হন।

সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল

পূর্ণগ্রহণের সময়ে চাঁদ সূর্য্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিলে, সূর্য্যের আকাশের দ্বিতীয় আবরণটিকে কি-রকম দেখায়, পূর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, কালো চাঁদটিকে ঘেরিয়া লাল বর্ণমণ্ডল কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! সূর্য্যের এই আবরণটা রঙিন্ বলিয়াই জ্যোতিষীরা ইহাকে বর্ণমণ্ডল অর্থাৎ Chromosphere নাম দিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো না, লাল ফুলঝুরি বা দেশলাই জ্বালাইলে যে লাল আগুন হয়, ইহা তাই। আমাদের পৃথিবীর আকাশে কেবল একটা আবরণ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল আছে। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উপর পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের দ্বিতীয় আবরণের গভীরতা কত জান ?—প্রায় তিন হাজার মাইল; কোনো কোনো স্থানে আবার দশ হাজার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় সূর্য্যটাকে ঘিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর যে বাষ্প দিবারাত্রি জ্বলিতেছে তাহা কি ভয়ানক! কেবল ইহাই নয়, পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময়ে জ্যোতিষীরা দেখিয়াছেন, বর্ণমণ্ডল হইতে এক-একটা শিখা এমন উঁচু হইয়া বাহির হয় যে, তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এখানে দুইটি শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ্যে কোনোটাই পঞ্চাশ হাজার



বর্ণমণ্ডলের অগ্নিশিখা

মাইলের কম উঁচু নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে একটা সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল, সে-সময়ে জ্যোতিষীরা একটা শিখাকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল উঁচু হইতে দেখিয়াছিলেন। সূর্য্যে যে কি অগ্নিকাণ্ড হইতেছে এবং সেই আগুন ঝড়ের মত উপর নীচে ছুটাছুটি করিয়া সূর্য্যকে কি ভয়ানকই করিয়া রাখিয়াছে, ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে।

ছবিতে যে মটরের মত সাদা বিন্দুটা রহিয়াছে, তাহা আমাদের পৃথিবী। বর্ণ-মণ্ডলের এক-একটা শিখা পৃথিবীর তুলনায় কত বড় তাহা ভাবিয়া দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের আগুন ঐ-সকল শিখায় রহিয়াছে!

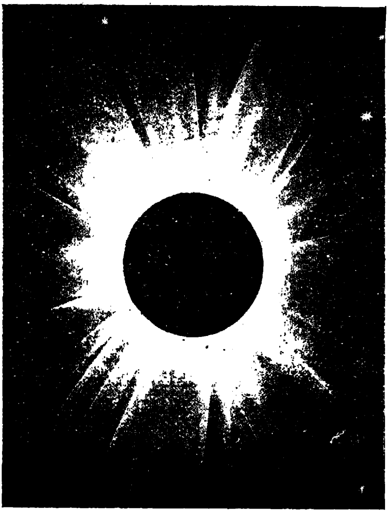
বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতা অদ্ভুত! খুব দূরের নক্ষত্র হইতে যে একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তাহা কোন্ কোন্ বাষ্প জ্বলিয়া জন্মিতেছে, এই ছোট পৃথিবীতে বসিয়া একটা খুব ছোট যন্ত্র দিয়া তাঁহারা স্থির করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নয়। মনে কর, তুমি খুব উঁচু এক পাহাড়ে চড়িয়া কতকগুলি বাষ্প মিশাইয়া আগুন করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরে বৈজ্ঞানিক-মহাশয় তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া সেই আলো দেখিতে লাগিলেন। এখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই যন্ত্র দিয়া বলিয়া দিতে পারেন, তুমি কোন্ কোন্ বাষ্প জ্বালিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ মাইল ত অতি সামান্য কথা, কোটি কোটি মাইল দূরে

নক্ষত্রদের উপরকার আলো কি কি পুড়িয়া জন্মিতেছে, তাহাও ঐ-রকমে তাঁহারা বলিয়া দিতেছেন এবং সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলে ও বর্ণমণ্ডলে কি কি জিনিস জ্বলিতেছে, তাহাও স্থির করিতেছেন। এই-রকমে সূর্য্যে আমাদের জানা-শুনা প্রায় কুড়িটি জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং তাহার সবগুলিই জ্বলিতেছে বলিয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। লোহা, সীসা, টিন ত আছেই এবং রৌপ্যও সম্ভবত আছে, কিন্তু ইহাদের সকলই বাষ্প হইয়া জ্বলিতেছে।

সূর্য্যের বর্ণ-মণ্ডল হইতে যে-সকল ভয়ানক লাল শিখা বাহির হয়, জ্যোতিষীরা পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময়ে তাহা যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে, সেগুলি হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ জ্বলিয়াই জন্মে। তা'ছাড়া ক্যাল্সিয়ম্ ও হেলিয়ম্ নামে আমাদের জানা-শুনা দুইটা জিনিসও হাইড্রোজেনের সহিত মিশিয়া জ্বলে। কেবল জ্বলা নয়, জ্বলিতে জ্বলিতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং একটু ঠাণ্ডা হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের বেগে উপরে উঠে। সেখানে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়, একবার ভাবিয়া দেখ !

সূর্য্যের ছটা-মণ্ডল

সূর্য্যের শেষ আবরণ ছটা-মণ্ডলের কথা এখনো বলা হয় নাই। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা একটি সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে তোলা হইয়াছিল। সূর্য্যের



পূর্ণ গ্রহণের সময়ে সূর্য্যের ছটা-মণ্ডল

আলোকের উৎপাতে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ ছাড়া আর কোনো সময়ে ইহা দেখা যায় না, সূর্য্যের আলোক ইহাদিগকে সকল

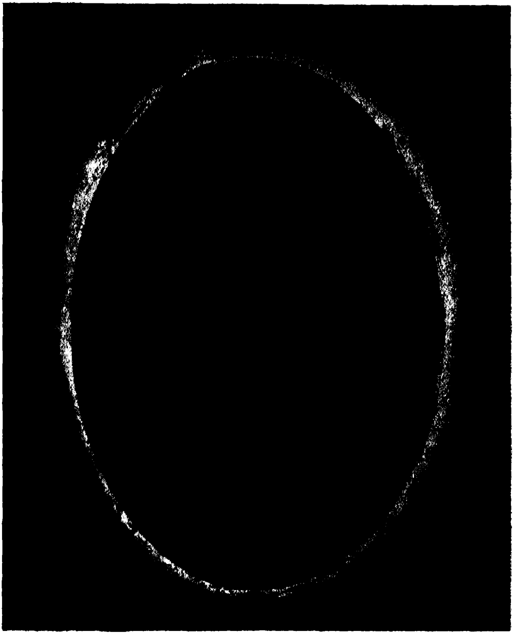
সময়ে ডুবাইয়া রাখে। যেই চাঁদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া কালো করিয়া দেয়, অমনি সূর্য্যের আকাশের এই ছটা-মণ্ডল দেখা যায়।*

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহা ছটার মতই সূর্য্য হইতে বাহির হইয়াছে, এইজন্যই জ্যোতিষীরা সূর্য্যের আকাশের এই অংশকে ছটা-মণ্ডল (Corona) বলেন। কিন্তু ইহার গভীরতা বর্ণ-মণ্ডলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল নয়। সূর্য্যের বাহিরে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া ইহার স্থান। ১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে সূর্য্য হইতে এক কোটি মাইল দূরে ছটা-মণ্ডল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাঁদে-ঢাকা কালো সূর্য্য, তার পরে সেই রঙিন্ বর্ণ-মণ্ডল এবং শেষে এই ছটামণ্ডল সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোহিত হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া ও বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

কি কি জিনিস জ্বলিয়া সূর্য্যের ছটামণ্ডল জন্মিয়াছে, তাহা জানা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূর্য্য-গ্রহণের সেই দুই চারি মিনিট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানাশুনা জিনিসের মধ্যে

---

* গ্রহণের সময় ছাড়া অপর সময়ে সূর্য্যের বর্ণ-মণ্ডল পরীক্ষা করিবার এক উপায় আজকালকার জ্যোতিষীরা বাহির করিয়াছেন, কিন্তু ছটামণ্ডলকে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ ছাড়া আর কখনই চক্ষে দেখা যায় না।



পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ

সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে কালো করিয়া দিয়াছে।

তাঁহারা উহাতে হাইড্রোজেনের বাষ্পই জ্বলিতে দেখিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো যে অনেক বাষ্প জ্বলে, জ্যোতিষীরা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে-সব বাষ্প আমাদের পৃথিবীতে নাই, কাজেই তাঁহারা তাহাদের নামও বলিতে পারেন নাই। দেখ, আমাদের সূর্য্যটি কি জিনিস!

এখন বোধ হয়, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, বড় বড় জ্যোতিষীরা এত খরচ-পত্র করিয়া এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কেন দূর দেশে পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ দেখিতে আসেন। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে, মাঝ সমুদ্রে বা বরফ-ঢাকা মেরুদেশে না গেলে সূর্য্য-গ্রহণ দেখা যাইবে না। জ্যোতিষীরা জাহাজে করিয়া সেই সব স্থানে গিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া সূর্য্য-গ্রহণ দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল। তখন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসার এখনকার মত সুবিধা ছিল না। জ্যোতিষীরা এই অসুবিধা গ্রাহ্য করেন নাই। দলে দলে অনেক জ্যোতিষী ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-জ্যোতিষী জান্‌সেন্ সাহেব এই দলে ছিলেন। তিনি গ্রহণের সময়ে সূর্য্যের অনেক ছবি উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলি হইতে সূর্য্যের আকাশ-সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনো অনেক খবর জানিতে বাকি আছে, তাই পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণ হইলে জ্যোতিষীরা আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না।

ফরাসী জ্যোতিষী জান্‌সেনের নাম করায় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের সহিত জর্ম্মান্‌দের একটা ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল। দুই পক্ষই বলশালী, অনেক ছোটখাটো যুদ্ধের পর জর্ম্মান্‌-সৈন্য আসিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্‌ সহরকে ঘেরিয়া ফেলি। নগরের চারিদিকেই জর্ম্মান্‌-সৈন্যের কড়া পাহারা বসিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের লোকদের নিকটে গিয়া খাবার-দাবার দিয়া আসিবে, তাহারো পথ বন্ধ। তখন জান্‌সেন্‌ সাহেব দুর্ভাগ্যক্রমে পারিসে ছিলেন, কাজেই তাঁহাকেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল।

যাহা হউক, এই সময়ে একটা বড় রকমের সূর্য্য-গ্রহণ হইবার কথা ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া সূর্য্য-সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন বলিয়া জান্‌সেন্‌ সাহেব বহুদিন ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্রমে গ্রহণের দিন কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু জর্ম্মান্‌দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবেন, তাহার আশা রহিল না। জান্‌সেন্‌ খুব দুঃখিত হইলেন এবং পারিসের বাহিরে যাইবার জন্য খাঁচার পাখীর মত ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিলেন। গ্রহণের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তিনি এমন অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্য পারিসে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন,

শত্রুদের মাঝ দিয়াই চলিয়া যাইবেন, তাহাদের গোলা-গুলিতে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল।

এই সময়ে জান্‌সেন্ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার একটি ভাঙা ব্যোমযান আছে। সেই অন্ধকার রাত্রিতে তিনি ঐ ব্যোমযানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। জর্ম্মানেরা যদি জন্‌সেনের এই পলায়নের খবর একটুও জানিতে পারিত, তাহা হইলে একটি মাত্র গোলার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। জ্ঞানলাভের জন্য জান্‌সেনের মনে যে ব্যাকুলতা আসিয়াছিল, মৃত্যুর আশঙ্কাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই।

সূর্য্যের আলোক ও তাপ

সূর্য্যের মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু এখনো উহার অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিষীরাও জানেন না, যাহা তাঁহারা জানেন, তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল। তোমরা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে পারিবে ও বুঝিবে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এখানেই সূর্য্যের গল্প শেষ করিব।

সূর্য্যের আলো যে কত বেশি তোমরা তাহা প্রতিদিনই দেখিতেছ। পণ্ডিতেরা এই আলোর একটা হিসাব করিয়াছেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলো কত তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ঐ চাঁদের আলোতে বই পড়াও যায়, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যায় ছয় লক্ষ চাঁদের আলো একত্র না করিলে একটা সূর্য্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। ছয় লক্ষ চাঁদ বড় সোজা কথা নয়। এত-গুলো চাঁদ যদি এক সঙ্গে আকাশে উঠে, তাহা হইলে সব আকাশটা চাঁদে চাঁদে ভরিয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সব আকাশটা যদি চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলেই কেবল সূর্য্যের মত আলো আমরা পাইতে পারি। দেখ সূর্য্য কত আলো দেয়! বিজ্ঞানের দ্বারা, লোকে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো, লাইম্ আলো, কত আলোই প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু সূর্য্যের আলোর সমান একটি আলোও এ-পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই!

সূর্য্যের আলো যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি। সূর্য্য কত দূরে আছে; তাহা ত তোমরা শুনিয়াছ। এত দূরে থাকিয়া সূর্য্য যে তাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। বাকি সবই মহা-আকাশের মহাশূন্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই একটুখানি তাপের যে কত তেজ, তাহা প্রতিদিনই তোমরা দেখিতে পাও। সূর্য্যের তাপে খাল-বিল, নদী-নালা সব শুকাইয়া যায়, এক এক সময়ে এত তাপ হয় যে, ছাতা মাথায় দিয়াও দুপরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। এত দূরে থাকিয়া যে এত তাপ দিতে পারে, তাহার কাছে গেলে যে কত তাপ পাওয়া যায়, এখন তোমরা ভাবিয়া দেখ!

জ্যোতিষীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক। তাঁহারা যাহা দেখেন ও যাহা শুনেন, তাহা লইয়া হিসাব-পত্রে বসিয়া যান। কত পরীক্ষা ও কত অঙ্ক কষার পরে তবে তাঁহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত সূর্য্যটা কত তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীরা অনেক অঙ্ক কষিয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন জ্যোতিষী বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর বরফ দিয়া মোড়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্য নিজের তাপ দিয়া এই পঞ্চাশ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ! আর একটা হিসাবের কথা বলি। দুই হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া

জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহা মাপিয়া দেখিতে পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত দুই জন মানুষ হয় ত কোনো গতিকে বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র। সূর্য্যের উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ বাহির হয়, আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়লা না পুড়াইলে তাহা পাওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখ, কত কোটি কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে সূর্য্যের তাপের মত তাপ আমরা এক ঘণ্টার জন্য সৃষ্টি করিতে পারি।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য্য যে ক্রমাগত এই রকম ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোথা হইতে আসে ? উননে কয়লার আগুন জ্বালা হইয়াছে, এই আগুন এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা বেশ জ্বলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়া যাইবে। উননের আগুন যদি ঠিক রাখিতে চাও, তাহা হইলে মাঝে মাঝে উননে নূতন করিয়া কয়লা দিতে হইবে। সূর্য্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই। ইহাতে কে কয়লা জোগায় এবং কি-রকমেই বা ইহার কয়লার জোগাড় হয়, তোমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পার কি ? একজন জ্যোতিষী হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটা কয়লা দিয়াই প্রস্তুত হইত এবং এই কয়লা পুড়াইয়া যদি সূর্য্য তাপ দিত, তাহা হইলে এক হাজার বা দুই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্ত কয়লা নিঃশেষে পুড়িয়া যাইত এবং সূর্য্য নিভিয়া এক

গাদা ছাই হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু দুই হাজার বৎসরেও ত সূর্য্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে সূর্য্যের তাপ রক্ষা হয় না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা বহিয়া ঢালিবে ? ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায় ?

সূর্য্য কি-রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে, তাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাব-পত্র করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে, সূর্য্য নিজের শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার তাপ রক্ষা করে।

কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিলে না। একটু বুঝাইয়া বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি জোর করিয়া আকারে ছোট করা যায়, তাহা হইলে পদার্থ-মাত্রই গরম হইয়া পড়ে। ইট্ বা পাথরের মত শক্ত জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-সকল জিনিস বাতাসের মত বাষ্পীয় অবস্থায় থাকে, চাপ দিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা যায়।

ফুট্বলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্লাডারের ভিতরে তুমি যে বাতাসটা পম্প্ করিয়া দাও, তাহা বাহিরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে। কাজেই বাহিরের অনেকটা বাষ্পকে জোর করিয়া যখন ছোট ব্লাডারের মধ্যে পোরা যায়, তখন বাতাসকে সঙ্কুচিত করা হয়। সদ্য সদ্য পম্প্ করার পরে তুমি যদি ব্লাডারে হাত দাও, তবে দেখিবে রবারের

উপরটা গরম হইয়াছে। বাইসিকেল্ গাড়ীর চাকায় যে রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে জোর করিয়া যখন অনেক বাতাস পম্প্ করা যায়, তখন সেটাও গরম হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, বাষ্পীয় জিনিস সঙ্কুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়া পড়িলে তাহাতে তাপের সৃষ্টি হয়।

সূর্য্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন আজও ঠাণ্ডা হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া পণ্ডিতেরা ব্লাডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়া গড়া নয়, উহার দেহে কেবল বাষ্পই আছে। বাষ্প জিনিসটার আর একটা প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে খুব ছোট হইয়া আসে। কাজেই সূর্য্যের দেহের বাষ্প তাপ ছাড়িয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু দেহ সঙ্কুচিত হইলে তাহাতে তাপ জন্মে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূর্য্যের দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, তেমনি সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও সৃষ্টি হইতেছে। 'যত্র আয় তত্র ব্যয়', কাজেই এত তাপ খরচ করিয়াও সূর্য্য ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না।

মহাপ্রলয়

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রতিদিনই সূর্য্য যখন নিজের দেহকে একটু-একটু ছোট করিয়া ফেলিতেছে, তখন গত বৎসরের সূর্য্যের চেয়ে এ বৎসরের সূর্য্যকে ছোট দেখি না কেন? জ্যোতিষীরা তোমাদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন বিশ্ব-সংসারে মানুষ জন্মে নাই এবং পৃথিবীর জন্ম হয় নাই, সেই অতি পুরাতন কালে, সূর্য্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের যে জায়গায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ ও নেপ্চুন রহিয়াছে, সূর্য্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া ছিল। জায়গা জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা খুবই হাল্কা ছিল। এখন সূর্য্যের দেহে যে ঘন বাষ্প আছে, তখন ইহা অপেক্ষা খুব হাল্কা বাষ্প তাহার দেহে ছিল। সেই সময় হইতে আজ-পর্য্যন্ত সূর্য্য নিজের দেহ গুটাইয়া ছোটই করিয়া আসিতেছে। তাই সূর্য্য আগেকার তুলনায় এত ছোট। যাহা হউক, সূর্য্যের ছোট হইবার ভাবটা এখনো আছে, কিন্তু এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিতান্ত অল্প, তাই এখন দুই দশ বৎসরে বা দু-হাজার দশ-হাজার বৎসরে সূর্য্য কতটা ছোট হইল, তাহা নজরেই পড়ে না।

মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল বোঝাই আছে, আর তুমি যেন সেই জালা হইতে প্রতিদিন

এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছে। প্রতিদিনই এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় এত সামান্য যে, তুমি দু-বছরে কি দশ-বৎসরেও চোখে দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বৎসরে সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, দু-হাজার দশ হাজার বৎসরে আমরা সূর্য্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও ছোট দেখিব না।

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্য্যকে নিশ্চয়ই ছোট হইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্য্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে সূর্য্য ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ভ হইবে। কারণ সূর্য্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া সূর্য্য এক দিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। মেঘ হইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া

দাঁড়াইবে। সূর্য্যের আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা আমাদের খাদ্য জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের চিহ্নমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না।

সূর্য্য নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় পর্ব্বত ব্যতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লিষ্ট ঋষির মত তাহার শরীর তখন কঙ্কালসার হইবে এবং মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে।

এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছে। প্রতিদিনই এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় এত সামান্য যে, তুমি দু-বছরে কি দশ-বৎসরেও চোখে দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বৎসরে সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, দু-হাজার দশ হাজার বৎসরে আমরা সূর্য্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও ছোট দেখিব না।

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্য্যকে নিশ্চয়ই ছোট হইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্য্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে সূর্য্য ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ভ হইবে। কারণ সূর্য্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া সূর্য্য এক দিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। মেঘ হইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া

দাঁড়াইবে। সূর্য্যের আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা আমাদের খাদ্য জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের চিহ্নমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না।

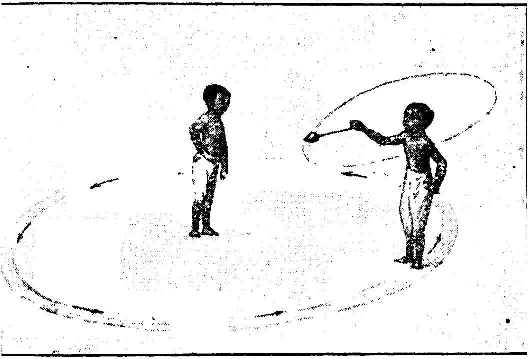
সূর্য্য নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুষ্যজাতি পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় পর্ব্বত ব্যতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লিষ্ট ঋষির মত তাহার শরীর তখন কঙ্কালসার হইবে এবং মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে।

চাঁদ

এখন চাঁদের কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, চাঁদ সেই-রকম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এজন্য পৃথিবী গ্রহ এবং চাঁদ তাহার উপগ্রহ। সে যেন পৃথিবীরই অধীনে আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের সঙ্গে সূর্য্যের যে কোনো সম্বন্ধ নাই, এ-কথা বলা যায় না। কারণ পৃথিবীর চারিদিকে যখন চাঁদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যকে ঘুরিতে থাকে। এজন্য চাঁদের গতিটা বড়ই গোলমেলে রকমের।

একটা উদাহরণ দিয়া চাঁদের গতিটা বুঝানো যাক্। মনে কর, তুমি যেন সূর্য্য হইয়া মাঝে দাঁড়াইয়া আছ, আর তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার চারিদিকে পৃথিবী সাজিয়া ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন চাঁদ হইবে কে? যে চাঁদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে ঘুরিতে হইবে। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক্, ধরণীকে বলা যাউক, সে যেন একটা ঢিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকে। ধরণী ঢিলে দড়ি বাঁধিল এবং তাহার মাথার চারিদিকে সেই ঢিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে তোমারো চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কাজেই চাঁদ

যেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে আসে, এখানে দড়িতে-বাঁধা ঢিলটাও সেই-রকম ধরণীর চারি-



ধরণী ঢিলে দড়ি বাঁধিয়া তাহা মাথার চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্য বালকটির চারিদিকে ঘুরিতেছে।

দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া আসিল। তাহা হইলে এই ঢিলের গতি ঠিক্ চাঁদের মতই হইল না কি ?

পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, চাঁদকে আমরা পৃথিবী হইতে প্রায় সূর্য্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাঁদ কখনো সূর্য্যের মত বড় জিনিস নয়। নক্ষত্রদের চেয়ে চাঁদ অনেক ছোট, তা'ছাড়া আর যাহা কিছু আকাশে খালি চোখে দেখা যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট, অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড়

জ্যোতিষ্ক আছে, তাহাদের সব চেয়ে চাঁদই ছোট। কিন্তু মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পৃথিবীর কাছে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি।

চাঁদকে ছোট বলিলাম, তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন তাহা আমাদের খেলার ফুট্‌বলের মত ছোট বা ধান রাখিবার মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাড়ের মত ছোট, বা হিমালয় পর্ব্বতের মত ছোট। পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, তাদের সব-চেয়ে চাঁদ বড়। কিন্তু আকাশে থাকিয়া যত গ্রহ-নক্ষত্র রাত্রিতে আলো দেয়, তাহাদের সব চেয়ে চাঁদ ছোট। সূর্য্যের তুলনায় চাঁদ কত ছোট তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। কিন্তু চাঁদ আবার পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট যে, বিধাতা পুরুষ যদি চাঁদ দিয়া এই পৃথিবীর মত আর একটা পৃথিবী গড়িতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশটা চাঁদকে ভাঙিয়া কাদা না করিলে পৃথিবী গড়িতে পারিবেন না। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, আমাদের পৃথিবীটাকে যদি ধরা যায় একটা বড় মার্ব্বেল কিম্বা একটা মাঝারি গোছের মাটির ভাঁটা, তাহা হইলে চাঁদ হইয়া দাঁড়ায় একটা ছোট মটরের মত।

আর একটা হিসাবের কথা বলি। তোমরা ছোট বেলায় ছেলে-ভুলোনো গল্পে শুনিয়াছ, মাটির তলায় পাতালে, এক রাজার বাড়ী আছে; সেখানে এক রাজ-কন্যা আছেন, দৈত্য-দানব কত কি আছে। এ-গল্পটা যদি তোমাদের মনে না থাকে, তোমাদের ঠাকুরমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়ো।

গল্পটা আমার একটুও মনে নাই, তা' না হইলে এখনি তাহা তোমাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিতাম। যাহা হউক মনে কর, তোমরা যেখানে বসিয়া বই পড়িতেছ, সেখানে একটা প্রকাণ্ড কূয়ো খুঁড়িয়া পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় যাইবার চেষ্টা কবিতেছ। কত খুঁড়িলে গল্পের সেই পাতালপুরীতে পৌঁছানো যাইবে, আন্দাজ করিতে পার কি? পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কূয়োটাকে প্রায় চারি হাজার মাইল খুঁড়িতে হইবে। কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব প্রায় হাজার মাইল। কাজেই দেখ, কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব যত দূরে কূয়োটাকে তাহারি চারিগুণ গভীর করিতে হইবে।

কিন্তু কেউ যদি চাঁদে গিয়া কূয়ো খুঁড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এক হাজার মাইল খুঁড়িলেই চাঁদের ঠিক মাঝখানে গিয়া পৌঁছিবে। ইহাও বড় কম দূর নয়। কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর মাঝে পৌঁছিতে যত খুঁড়িতে হয়, চাঁদের মাঝে যাইতে তাহার সিকি খুঁড়িলেই চলে। দেখ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে কত ছোট!

কত দূরে থাকিয়া চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে এখন দেখা যাউক। চাঁদ পৃথিবীর প্রায় কোলের কাছে আছে, এজন্য জ্যোতিষীরা ইহার দূরত্বের খুব সূক্ষ্ম হিসাব করিতে পারিয়াছেন। তোমাদের চেয়ে যাঁহারা বয়সে বড়, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, চাঁদ

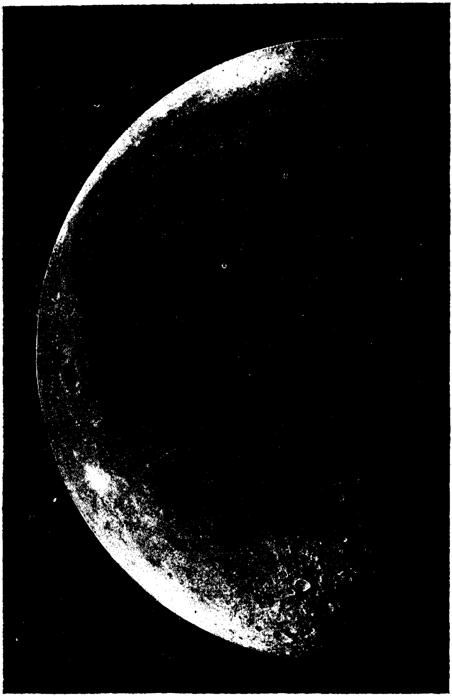
পৃথিবী হইতে প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। কিন্তু এই দূরত্বটা কত, মনে মনে আন্দাজ করিতে পার কি? আচ্ছা, সূর্য্যের দূরত্ব ঠিক করিবার সময়ে আমরা যে রেলের গাড়ীর উদাহরণ লইয়াছিলাম, এখানে সেই-রকম একটা কিছু লওয়া যাক্।

মনে কর, আজকালকার নূতন ব্যোমযান অর্থাৎ এরোপ্লেনে চড়িয়া আমরা যেন চাঁদের রাজ্য দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছি। এরোপ্লেন্ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে চাঁদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দিবারাত্রি তাহার বিরাম নাই। তাহার কলটা যেন কেবলি বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। কতদিনে তাহা চাঁদে পৌঁছিবে আন্দাজ করিতে পার কি?—প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস লাগিবে। সূর্য্যের দূরত্ব হিসাব করিবার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর ডাক-গাড়ী যদি শূন্য দিয়া সূর্য্যে পৌঁছিতে যায়, তবে তাহাকে তিনশত পঞ্চাশ বৎসর দিবারাত্রি হুস্ হুস্ করিয়া চলিতে হয়। কোথায় সাড়ে পাঁচ মাস, আর কোথায় সাড়ে তিনশত বৎসর। ভাবিয়া দেখ, চাঁদ সূর্য্যের তুলনায়, পৃথিবীর কত কাছে! আর এত কাছে আছে বলিয়াই, আমরা ছোট চাঁদটিকে এত বড় দেখি!

তোমরা দূরবীণ দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক তবে, আতসী কাঁচ দিয়া বই পড়িতে গেলে বইয়ের অক্ষর-গুলি কি-রকম বড় দেখায়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা

নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। দূরবীণে চোখ লাগাইয়া চাঁদ বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, সেগুলিও ঐ-রকমেই বড় দেখায়। এজন্য খালি-চোখে আকাশের যে-সব জিনিসকে দেখা যায় না, দূররীণ দিয়া দেখিলে তাহাদিগকে দেখা যায়। যদি তোমরা একটা ছোট দূরবীণ হাতের গোড়ায় পাও, সকলের আগে একবার চাঁদকে দেখিয়া লইও। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আর কখনো দেখিবে না!

আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়া দেখিলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে না থাকিয়া কেবল চল্লিশ মাইল দূরে থাকিলে চাঁদ যেমনটি দেখাইত, ঠিক সেই-রকমই বড় দেখায়। চল্লিশ মাইল দূরের জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ। দূরবীণ দিয়া দেখিয়া চাঁদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে পাইয়াছি। ইহাতে চাঁদের উপরকার সব খবর জানিবার শুনিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা আছে, যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই সেখানে কোথায় সমুদ্র আছে, কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার জীবজন্তু গাছ-পালা কি-রকম, এ-সব আমরা জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই রকমের অজানা দেশ। সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফ-ঢাকা সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই; কাজেই সেখানকার সকল অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু চাঁদের যতটা পৃথিবী হইতে



চাঁদের উপরকার অবস্থা

দেখা যায়, তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জানা আছে। পৃথিবীর কোথায় কোন্ সমুদ্র, কোথায় কোন্ পর্ব্বত আছে, আমরা ম্যাপে তাহা আঁকিয়া রাখি। জ্যোতিষীরা চাঁদেরও সেই-রকম ম্যাপ্ আঁকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্রের এক-একটা নামও দিয়াছেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দেখিবার শুনিবার জিনিস চাঁদে অনেক আছে। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে চাঁদকে যে-রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, এটা পূর্ণিমার চাঁদের ছবি নয়। পূর্ণিমার পরে কি-রকম এক-একটু করিয়া চাঁদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ছবিখানি পূর্ণিমার ছয় সাত দিন পরে উঠানো হইয়াছিল, এজন্য ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ ছবি দেখিতে কেমন!

চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বত

ছবির উপরে যে-সব গোল গোল চিহ্ন আছে, সেগুলি কি বলিতে পার কি? এগুলিকে জ্যোতিষীরা চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বতের গর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিসুভিয়স, এট্‌না প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্নেয় পর্ব্বতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই সকল পর্ব্বতের চূড়ায় ভয়ানক গর্ত্ত থাকে, তাহা হইতে সময়ে সময়ে ধোঁয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের গ্রাম নগর ছাইয়া ফেলে। কখনো কখনো আবার সেই গর্ত্ত দিয়া আগুনের মত গরম গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হয় এবং পাশের গ্রাম নগর ডুবাইয়া দেয়।

বিসুভিয়স্ পর্ব্বতের অগ্নিবৃষ্টি অনেক দিন আগে পম্পে নগরকে এইরকমে একবার নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে-সময়ে বিসুভিয়স্ হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব-জন্তু সব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখন লোকে সেই সকল ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির করিতেছে। যাহা হউক, চাঁদের উপরে যে-সব আগ্নেয় পর্ব্বতের গর্ত্ত দেখিতেছ, তাহা হইতে কিন্তু এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, হইলে তাহা দূরবীণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাইতাম।

জ্যোতিষীরা দুই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া চাঁদের পাহাড়-পর্ব্বত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের একটুও পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন চাঁদকে এত বড় করিয়া দেখায় যে, চাঁদে যদি কলিকাতার হাইকোর্ট, জেনারেল্ পোষ্ট-অফিস্ বা মনুমেণ্টের মত একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই নূতন বাড়ী, এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত এরকম কিছুই দেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতুল গড়িয়া ঘরে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যায়, চিরদিনই সেই-রকম থাকে; চাঁদও যেন সেই-রকম একটি পুতুল। বৎসরের পর বৎসর চাঁদকে দেখিয়া শুনিয়া ইহার একটুও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

কিন্তু খুব প্রাচীন কালে চাঁদের সব আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে যে ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গলা ধাতুর স্রোত বাহির হইয়া চারিদিক ডুবাইয়া দিত, এখনো এত দূর হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

পরপৃষ্ঠায় চাঁদের একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের বড় ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, চাঁদের উপরকার কতক জায়গা যেন খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং তাহার মাঝে যেন কয়েকটা উঁচু-উঁচু পাহাড় আছে। চাঁদের আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট গোলাকার আগ্নেয় পর্ব্বত দেখিয়াছ, তাহাদের আকৃতি ঠিক এই-রকমের অর্থাৎ চারিদিকে

উঁচু প্রাচীর, মাঝে একটা বা দুইটা উঁচু পাহাড়। যে আগ্নেয় পর্ব্বতের ছবিটা এখানে দিলাম, তাহার নাম কোপারনিকাস্।



চাঁদের কোপারনিকাস্ আগ্নেয় পর্ব্বত

"কোপারনিকাস্" নাম শুনিয়া অবাক্ হইও না; এ নাম আমাদেরই দেওয়া। তোমার যদি দুইটা পোষা কুকুর থাকে, এবং তাহাদের একটা কালো ও একটা সাদা হয়,

তাহা হইলে প্রত্যেককে এক-একটা পৃথক নাম দিতেই হয়। তাহা না হইলে যখন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে চাও, তখন কেবল তুতু করিয়া ডাকিলে দুইটাই কাছে আসিবে। কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুরটিকে "কালু" এবং সাদাটিকে "টেবি" বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিয়া ডাকিলে কালো কুকুরই কাছে আসিবে এবং টেবি বলিয়া ডাকিলে সাদাটাই কাছে আসিয়া তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে। ইহাও যেন সেই-রকম; চাঁদের বড় বড় আগ্নেয়-পর্ব্বতগুলি ও সমুদ্রগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পর্ব্বতের সঙ্গে আর একটা পর্ব্বতের গোলমাল হয় না।

চাঁদের পর্ব্বতের নাম দেওয়ার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমাদেরি মত ছোট ছেলেদের দূরবীণ্ দিয়া চাঁদ দেখাইতেছিলাম। চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উঁচুনীচু মাটি দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া যাইতেছিল। নিকটে একটি অল্পশিক্ষিত ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকেও দূরবীণ্ দিয়া চাঁদ দেখাইলাম এবং কোন্ পাহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মত চাঁদেও পাহাড় পর্ব্বত আছে দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইল চাঁদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া। সে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, কল দিয়া ত চাঁদের পাহাড় দেখাইলেন; কিন্তু পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে?"

আমরা ত হাসিয়াই খুন। চাঁদের পাহাড় দেখিয়া লোকটা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো যন্ত্র দিয়া পাহাড়ের নামগুলাও হয় ত চাঁদ হইতে পৃথিবীতে আমদানী করিয়াছি। আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা বা জীবজন্তুর নাম বিধাতা তাহাদের গায়ে লিখিয়া দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য মানুষেই তাহাদের এক-একটা নাম দেয়।

চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বতের বিবরণ বলিতে গিয়া অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার "কোপার্-নিকাস্" আগ্নেয় পর্ব্বতের ছবিটি দেখা যাউক্। ইহার চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় বেড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কম উঁচু নয়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার উচ্চতা দুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাড়ের উচ্চতা আরো বেশি। তাহার পরে যে জায়গা ঘেরা রহিয়াছে, মাপিলে তাহা প্রায় ছাপ্পান্ন মাইলের সমান হয়। তাহা হইলে দেখ, ঐ পাহাড়-ঘেরা গোলাকার জায়গাটাও নিতান্ত ছোট-খাটো স্থান নয়। ছাপ্পান্ন মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার স্থান দুই মাইল উঁচু পাহাড়-দিয়া ঘেরা এবং ঘেরা জায়গার মধ্যে আবার দুই একটা উঁচু চূড়াযুক্ত পাহাড়। চাঁদের সকল আগ্নেয় পর্ব্বতই যে এত বড় তাহা নয়। কোনোটিকে ইহা অপেক্ষা অনেক ছোটও দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক আগ্নেয়গিরির গঠন ঠিক একই রকমের।

আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নেয় পর্ব্বত আছে, তাহাদের সঙ্গে চাঁদের পর্ব্বতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কোনো আগ্নেয় পর্ব্বত দুই তিন মাইল উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং তাহাদের কোনোটিরই মুখ পঞ্চাশ মাইল বা একশত মাইল চওড়া নয়। চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বতগুলির অবস্থা এ-রকম কেন হইয়াছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ হয় পারিবে না; জ্যোতিষীরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কারণ স্থির করিয়াছেন।

ইহা বুঝিতে হইলে পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণের কথা একটু জানা আবশ্যক। পৃথিবী তাহার উপরকার সকল জিনিসকে নিজের দিকে টানে, এজন্য আমরা জিনিসকে ভারি বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওজনের একটা লোহার গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কষ্ট হয় দেখিয়াছ ত? গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাহাকে উপর দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান, অধিক না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে না। এজন্য কোনো জিনিসকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে বেশ্ জোর লাগে।

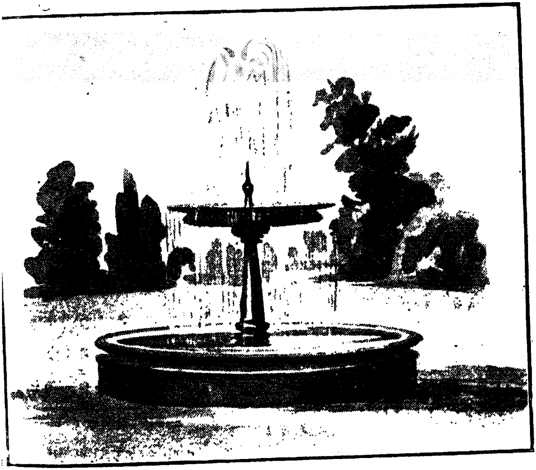
চাঁদের দেহটা পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এজন্য সে তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে পারে না, এজন্য চাঁদে সব জিনিসই হাল্‌কা। হিসাব করিয়া

দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, চাঁদে তাহার ওজন মোটে এক সের। তুমি কত ভারি জিনিস মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। বোধ হয় দশ সের জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইলে চাঁদে তুমি ষাট্ সের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে পারিবে। তুমি কতটা লাফ্ দিতে পার ? হয় ত ছয় সাত হাতের বেশি পার না। তুমি চাঁদে গিয়া যদি লাফ্ দিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াসেই লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি। ঢিল ছুড়িয়া তুমি ঢিলটাকে কত উপরে উঠাইতে পার আন্দাজ করিয়া দেখিয়াছ কি ? তোমার হাতে যদি খুব জোর থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি ঢিলটাকে উপরে উঠাইতে পারিবে না ; কিন্তু চাঁদে গিয়া ঠিক সেইরকম জোরে ঢিল ছুড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত পর্য্যন্ত উপরে উঠিবে।

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না ; হয় ত তুমিও জান না। মনে করা যাক্, তোমার ওজন ত্রিশ সের। তুমি যদি চাঁদে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানে পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হইবে। কারণ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে খুব অল্প জোরে তোমার শরীরকে টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাকে, তাহা হইলে

দেখিবে তোমার শরীরের ওজন কমিয়া ত্রিশ সের হইতে পাঁচ সের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদের রাজ্যটা বড়ই অদ্ভুত নয় কি?

চাঁদে পঞ্চাশ এবং কখনো কখনো একশত মাইল চওড়া আগ্নেয়গিরি কি-রকমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝাইতে গিয়া চাঁদের এই-রকম অল্প টানের কথাটাকেই



ফোয়ারা

জ্যোতিষীরা বলিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় জলের ফোয়ারা দেখিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই-

রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে-পোঁতা নলের মুখ দিয়া শত শত ধারায় জল পিচ্‌কারীর মত জোরে উপরে উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকারে ফোয়ারার চারিধারে পড়িতে থাকে। ফোয়ারার জোর যত বেশি হয়, জলের ধারাও তেমনি বেশি উপরে ওঠে ও নামিবার সময়ে নল হইতে অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

জ্যোতিষীরা বলেন, দুই মাইল তিন মাইল উঁচু পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা আগ্নেয় পর্ব্বতগুলির আকৃতি ঐ-রকমেই হইয়াছিল। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন চাঁদের দেহের শত শত আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে গলা ধাতু ধোঁয়া ও ছাই ফোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তখন তাহা অনেক উপরে উঠিত। কারণ চাঁদের টান বেশী নয়। তাহার পরে যখন নামিত তখন আগ্নেয় গিরির ফোয়ারার মুখ হইতে অনেক দূরে গিয়া ছত্রাকারে পড়িত। জ্যোতিষীরা বলেন, এই রকমে দূরে ছত্রাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জমিয়া দুই মাইল তিন মাইল উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক কালে যে সত্য সত্যই চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে ছাই পাথর ও গলা ধাতু বাহির হইত, তাহা ঐ-সকল প্রাচীর দেখিলেই বুঝা যায়।

চাঁদের উপরকার অবস্থা

যেখানে এককালে আগ্নেয় পর্ব্বতের এত উপদ্রব ছিল, সেখানে যে আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে পারে না, তোমরা অনায়াসে তাহা আন্দাজ করিতে পার। সত্যই চাঁদের উপরে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া একটা সমতল জায়গা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুটবল্ খেলার মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ হয় চাঁদে মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উঁচু জমির পর নীচু জমি যেন সাজানো আছে। পৃথিবীর মত নরম মাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যায় না। বড় বড় আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে গলা ধাতু জমাট বাঁধিয়া সেখানকার মাটিকে এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা কলের লাঙ্গল দিয়া খুঁড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না।

তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর উপরে মোটে একভাগ স্থল এবং বাকী তিন ভাগ সমুদ্র। চাঁদে কিন্তু সমুদ্র কম। হিসাব করিলে দেখা যায়, চাঁদের উপরটাকে যদি তিনভাগ কর, তাহা হইলে কেবল একভাগ সমুদ্র ও বাকি দুই ভাগ স্থল হইয়া দাঁড়ায়। চাঁদে সমুদ্রের চিহ্ন থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। কাজেই আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাঁদে এখন সবই স্থল ; সেখানে এখন জলের নাম-গন্ধও নাই। জল

থাকিলে মেঘ হইত এবং মেঘে চাঁদের উপরটা ঢাকা পড়িয়া যাইত; তখন আমরা চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগ-গুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু চাঁদের কলঙ্ককে ত আমরা কখনই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। কাজেই মানিয়া লইতে হয় চাঁদে জল নাই।

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি কাজ করে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে। বৃষ্টির জল ও বরফ-গলা জল বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়া দেয়, উঁচু জমিকে নীচু করে এবং কখনো কখনো নীচু জমিকেও উঁচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বৎসর ধরিয়া জ্যোতিষেরা চাঁদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার ম্যাপ্ আঁকিতেছেন, কিন্তু এত বৎসরেও চাঁদের উপরকার মাটি-পাথরের একটুও পরিবর্ত্তন দেখেন নাই। ইহা দেখিয়াও তোমরা বলিতে পার চাঁদে জল নাই।

চাঁদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা জান না কি? ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে কিছু দিন বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা ধরে এবং এক-একটু করিয়া তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের উপরে ও মাটির উপরে বাতাস ঠিক ঐ-রকমেই কাজ করে। পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস একটু-একটু করিয়া ধূলা করিয়া দেয় এবং পরে সেই ধূলাকে উড়াইয়া দূরে ছড়াইয়া

ফেলে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উঁচু মাটির ঢিবি ছোট হইয়া আসে। কিন্তু চাঁদের পাহাড় ও উঁচু জমির এ-পর্য্যন্ত একটুও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাতে বাতাস আছে ইহা কেমন করিয়া বলি ?

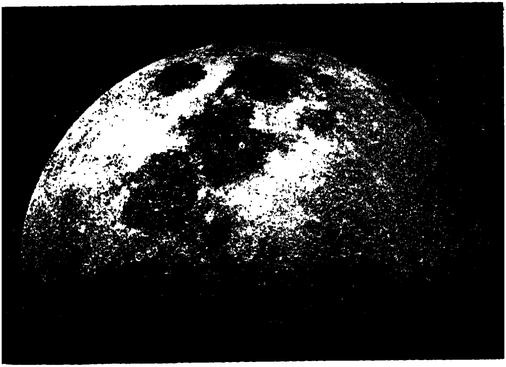
চাঁদে যে বাতাস বা জলের বাষ্প প্রভৃতি কোনো জিনিস নাই, তাহার আর একটা প্রমাণের কথা বলি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, খুব গভীর বাতাসের ভিতর দিয়া দেখিলে সব জিনিসকেই ম্লান বা অস্পষ্ট দেখা যায়। সকাল বেলা যখন সূর্য্য উঠে তখন তাহাকে কি রকম ম্লান দেখায় তাহা তোমরা দেখ নাই কি ? তখন তাহার দিকে বেশ তাকানো যায়। অস্তের পূর্ব্বে সূর্য্যকে ঠিক ঐ-রকমই ম্লান দেখায়। ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি ? উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্য্য তের্‌চা-ভাবে কিরণ দেয়, তাই সূর্য্যের আলোককে বায়ু ও নানা বাষ্পের গভীর স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয় এবং ইহাতে আলো কতকটা আট্‌কাইয়া যায়। তাই দুপুরের সূর্য্যকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, উদয়-অস্তকালের সূর্য্যকে সে-রকম দেখায় না।

বাতাস ও বাষ্পের আলো আট্‌কাইবার এই কথাটিকে মনে রাখিয়া, চাঁদের আকাশে যে বাতাস বা অন্য বাষ্প নাই, তাহা জ্যোতিষীরা প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়া আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে চাঁদ ছোট-বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া ফেলে। দেখা গিয়াছে, চাঁদের

পিছনে প্রবেশ করিবার সময়ে অতি ছোট নক্ষত্রদেরও আলো একটুও কমিয়া আসে না। যখন তাহারা চাঁদের পিছনে যায়, কেবল তখনি তাহারা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। চাঁদের আকাশে বাতাস থাকিলে কখনই এ-রকমে নক্ষত্রেরা অদৃশ্য হইত না। চাঁদের বাতাসে প্রথমেই তাহাদের আলো কিছু কিছু আট্‌কাইয়া যাইত এবং ইহাতে নক্ষত্রগুলিকে প্রথমে ম্লান দেখাইত, তাহার পরে চাঁদের পিছনে একেবারে লুকাইয়া পড়িলে তাহারা অদৃশ্য হইত। কিন্তু যখন নক্ষত্রেরা চাঁদে ঢাকা পড়ে, তখন কখনই এ-রকমটি দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয়, চাঁদে বাতাস বা জলের বাষ্পাদির নামগন্ধও নাই।

চাঁদের কলঙ্ক

এখানে চাঁদের আর একটা ফটোগ্রাফ-ছবি দিলাম। ছবিটা বোধ হয় শুক্লপক্ষের সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে উঠানো হইয়াছিল। এজন্য চাঁদের সব অংশ উহাতে দেখিতে পাইবে না।



অষ্টমীর চন্দ্র

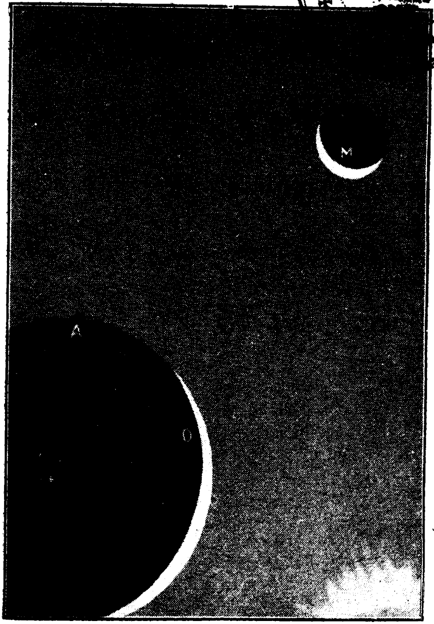
ছবির বাম দিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ এগুলি কি বলিতে পার কি? এগুলিই চাঁদের কলঙ্ক। খালি-চোখে ইহাদিগকে মোটা রেখার মত দেখায়, কিন্তু দূরবীণ্ দিয়া দেখিলে কালো কালো চওড়া দাগের মত

দেখায়। চাঁদের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বুড়ির আকৃতি আমরা ঐ-সব রেখা দিয়াই কল্পনা করিয়া লই।

জ্যোতিষীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বড় অদ্ভুত জবাব দেন। তাঁহাদের মতে এগুলি চাঁদের জলশূন্য সমুদ্র। গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকাইয়া গেলে যেমন এক-একটা গর্ত্তই দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের গর্ত্ত। তবে পুকুরের গর্ত্ত যেমন ছোট, চাঁদের সমুদ্রগুলির গর্ত্ত সে-রকম নয়। এগুলি খুব গভীর এবং শত শত মাইল জায়গা জুড়িয়া থাকে।

চাঁদের অপর অংশের তুলনায় এই শুক্‌নো সমুদ্রগুলি কেন এত কালো, এ-কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে হইতেছে। জ্যোতিষীরা ইহারো কারণ স্থির করিয়াছেন। সূর্য্যের যেমন নিজেরই আলো আছে, চাঁদের তাহা নাই, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। একখানা আয়না রৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন সূর্য্যের আলোতে ঝক্‌মক্ করে, চাঁদে সূর্য্যের আলো পড়ে বলিয়া চাঁদও সেই-রকমে ঝক্‌মক্ করে। এই রকম ধার-করা আলোতে উজ্জ্বল হইলে চাঁদের যে একটু আলো পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহাই আমাদের কাছে জ্যোৎস্নার আলো হইয়া দাঁড়ায়। সূর্য্য ডুবিয়া গেলে পৃথিবীতে যখন রাত্রি-হয়, তখনো চাঁদে কি রকমে সূর্য্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম। ইহা দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে।

চাঁদের কলঙ্ক



রাত্রে সূর্য্যের আলো চাঁদের উপরে পড়িয়া চাঁদকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে

কিন্তু মনে করিয়া দেখ, সূর্য্যের আলোতে ধরিলে সকল জিনিষই আয়নার কাচের মত ঝক্‌মক্ করে না। একখানা সাদা-রঙ্-করা কাঠ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে যতটা উজ্জ্বল দেখাইবে, কালো রঙ্-করা কাঠ ততটা দেখাইবে না। চাঁদের সমুদ্রগুলির রঙ্ কেন তাহার পাহাড়-পর্ব্বতের চেয়ে কালো দেখায় এখন তোমরা বুঝিবে। চাঁদের শুষ্ক সমুদ্রগুলির তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বাঁধিয়া আছে যে, তাহা কালো পাথর বা কালো রঙ্-করা কাঠের মত। কাজেই সূর্য্যের আলো পাইলে তাহা ঝক্‌মক্ করে না। এইজন্যই চাঁদের উঁচু স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্রের তলাগুলোকে কালো দেখায়।

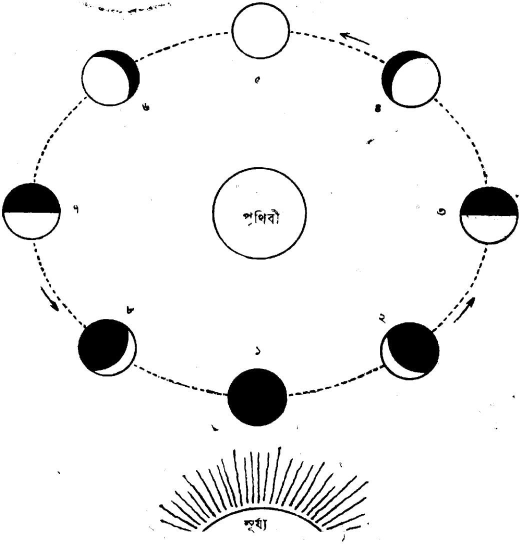
চাঁদের কলা

অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ার চাঁদ সরু কাস্তের মত পশ্চিম আকাশের নীচে দেখা দেয়,—তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া পূর্ণিমার দিন ঠিক গোল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরেই কৃষ্ণ-পক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চাঁদ একএকটু করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে সুরু করে। প্রায় পনেরো দিন পরে অর্থাৎ অমাবস্যায়, চাঁদকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

চাঁদের এই-রকম ক্ষয় ও বৃদ্ধি তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া চাঁদকে পরীক্ষা করিয়ো, তাহা হইলে বুঝিবে আমি যে-সকল কথা বলিলাম তাহা ঠিক্। যদি আমার কথাটাই ঠিক হয়, তাহা হইলে কি-রকমে চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়, তোমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে পার কি ?

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা দেখিলে বোধ হয় তোমরা চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই ছবির মাঝখানে আমরা পৃথিবীকে রাখিয়াছি, এবং তাহার চারিদিকে চাঁদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। সূর্য্য চাঁদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,—বাহিরে আছে। সূর্য্যের

আলো চাঁদের গায়ে লাগিয়া কি-রকমে তাহার কলার হ্রাস-বৃদ্ধি করায় এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে।



চন্দ্রকলার ক্ষয়বৃদ্ধি

চাঁদ যখন ছবির এক-নম্বর জায়গায় থাকে তখন কি হয় ভাবিয়া দেখ। এই অবস্থায় চাঁদ প্রায় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে পড়িয়াছে। কাজেই চাঁদের যে-পিঠে সূর্য্যের আলো

পড়ে তাহা পৃথিবী হইতে দেখা যায় না। পৃথিবী হইতে উহার অন্ধকার দিক্‌টাই দেখা যায়। সুতরাং এ-অবস্থায় আমরা চাঁদকে একেবারে দেখিতে পাই না। ইহাই অমাবস্যা। অমাবস্যায় চাঁদ দেখা যায় না।

তার পরে চাঁদ যখন অগ্রসর হইয়া দুই-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার যে আধ্‌খানায় সূর্যের আলো পড়ে, তাহার অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। ইহাই দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার চাঁদ। ইহার আকৃতি তখন সরু কাস্তের মত হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার পরে চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির তিন-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন চাঁদের আলোকিত অংশের আধ্‌খানা মাত্র আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। তার পরে চারি-নম্বর জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে এবং শেষে পাঁচ-নম্বর জায়গায় চাঁদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য্যের মাঝে থাকে; কাজেই চাঁদের যে আধ্‌খানা সূর্য্যের আলো পায়, তাহার সবটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহাই পূর্ণিমার চাঁদ।

পূর্ণিমার পরে চাঁদ যতই ছয়, সাত ও আট-নম্বর জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়টাতেই চাঁদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ। তার পর আট-নম্বর

জায়গা ছাড়িয়া আবার এক-নম্বর জায়গায় আসিলে চাঁদ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্যা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চাঁদ যে-সময়ে পৃথিবীকে একবার ঘুরিয়া আসে সেই সময়ে অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা হইতে আবার অমাবস্যা হয়।

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমরা জান। যদি না জানা থাকে তাহা হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে পারিবে। এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্যা হইতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহা হইলে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবী সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে যেমন তিন শত পঁইষট্টি দিন সময় লয়, চাঁদও সেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা খুব ভাল হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্যা সাড়ে উনত্রিশ দিন অন্তর হইলেও, চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সাতাইশ দিন আট ঘণ্টায়।

পাঁজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এ-রকম অমিল হইল, তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না ; কেবল এইটুকু মনে করিয়া রাখ যে, যখন চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন পৃথিবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। সে সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে। চাঁদের গতি এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময়গুলাকে একটু লম্বা করিয়া দেয়। যদি পৃথিবী সূর্য্যের মত

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে চাঁদের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ঠিক্ সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তরে হইত।

অমাবস্যার দুই দিন পরে যখন কাস্তের মত সরু চাঁদখানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি ভাল করিয়া চাঁদটিকে দেখ, তবে স্পষ্ট সমস্ত চাঁদকেই দেখিতে পাইবে। ইহা একটা মজার ব্যাপার নয় কি? সেই সময়ে কাস্তের মত অংশটা খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিষ্ট অংশে আব্‌ছায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যায়। কিন্তু এই আলোতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাঁদ কাস্তের মত নয়,—তাহা গোলাকার।

কাস্তের মত অংশটা কেন এত উজ্জ্বল তাহা তোমরা জান। কিন্তু বাকি অংশে এই আব্‌ছায়া আলো কোথা হইতে আসে, বলিতে পার কি? পঞ্চমী বা ষষ্ঠী তিথিতে চাঁদ যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন ঐ আব্‌ছায়া আলো দেখা যায় না। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পর্য্যন্ত উহা সুস্পষ্ট দেখা যায়।

চাঁদের নিজের আলো নাই। ধার-করা আলোতেই তাহার আলো, একথা তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কাজেই বলিতে হয়, দ্বিতীয়া তৃতীয়ার যে আব্‌ছায়া আলোতে চাঁদের অন্ধকার অংশের যে একটু নজরে পড়ে, তাহাও চাঁদের নিজের আলো নয়। তবে কাহার আলো? জ্যোতিষীরা ইহার মজার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা চাঁদের উপরকার

জ্যোৎস্নার আলো। চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোৎস্না দেয়, পৃথিবী তেমনি চাঁদের উপরে ঐরূপ জ্যোৎস্না দেয়।

বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না। আচ্ছা, মনে কর, তুমি যেন চাঁদের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছ এবং সেখান হইতে পৃথিবীকে দেখিতেছ। পৃথিবীকে তুমি একটা খুব বড় চাঁদের মতই দেখিবে। যদি অমাবস্যার দিন বা তাহার দু-তিন পরে তুমি চাঁদের অন্ধকার দিক্‌টায় থাক, তাহা হইলে তুমি পৃথিবীকে পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে পাইবে। তখন পৃথিবীর আলো—ঠিক্‌রাইয়া গিয়া চাঁদের যে অন্ধকার অংশে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে জ্যোৎস্না দেখাইতে থাকিবে। ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদের অন্ধকার অংশেও পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে, কিন্তু তখন চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আলোটা এত বেশি হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়িলেও তাহা নজরে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু যে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে, সেইখানে ঐ প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার আলো চোখেই পড়ে না। ইহাও যেন সেই রকম। পৃথিবীতে চাঁদ যে জ্যোৎস্না দেয় তাহার আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু চাঁদে পৃথিবী যে জ্যোৎস্না দেয় তাহার আলো আমাদের জ্যোৎস্নার প্রায় তেরো গুণ। তাহা হইলে দেখ, চাঁদে জ্যোৎস্না উঠিলে বেশি অন্ধকার থাকে না।

চাঁদের গ্রহণ

পাঁজি খোঁজ করিলে প্রতি বৎসরে একটা দুইটা বা তাহারো বেশি চন্দ্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা আছে দেখিতে দেখিতে পাইবে। পূর্ণিমা তিথি ভিন্ন চন্দ্রগ্রহণ হয় না। গ্রহণের সময়ে চাঁদখানিকে কি-রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত? কখনো কখনো সব চাঁদটাই একটু-একটু করিয়া ক্ষয় পাইয়া যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ-রকমও দেখা যায়, চাঁদের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে যেমন পূর্ণচন্দ্র ছিল তাহাই হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য যেমন একেবারে কালো হইয়া যায়, চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ ক্ষয় পাইলেও সে-রকম কালো হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো চাঁদের ক্ষয়-পাওয়া অংশে দেখা যায়।

ইহা দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, এবার যখন চন্দ্র-গ্রহণ হইবে তখন দেখিও।

চাঁদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, এখন দেখা যাউক। আলোর কাছে কোনো জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার একটা ছায়া পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিয়া দাঁড়াও, দেখিবে তোমার একটি ছায়া পড়িয়াছে। এই রকমে, যে ছায়া হয়, তাহা তোমার কোন্‌দিকে দেখা যায়, লক্ষ্য করিয়াছ কি?

তোমার যে দিকে সূর্য্য থাকে ঠিক তাহার উল্টা দিকে ছায়া পড়ে। মনে কর, প্রাতঃকালে তুমি পশ্চিম-মুখ হইয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছ,—সূর্য্য তখন পূর্ব্বদিকে আছে। এখন ছায়াটা কি-রকম পড়িয়াছে যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার একটা লম্বা ছায়া সূর্য্যের উল্টা দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে।

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো নাই। কাজেই সূর্য্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উল্টা দিকে তাহাদের এক-একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে। এই ছায়াকে আমরা অবশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাই না, কারণ ছায়া যতই বড় হউক, কোনো জিনিসের উপরে না পড়িলে তাহা দেখা যায় না। কাজেই সূর্য্যের আলোতে পৃথিবীর ছায়া বা চাঁদের ছায়া সর্ব্বদা আকাশে থাকিলেও তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। যখন তাহা আকাশের কোনো বড় জিনিসের উপরে পড়ে তখনই আমরা তাহা দেখিতে পাই।

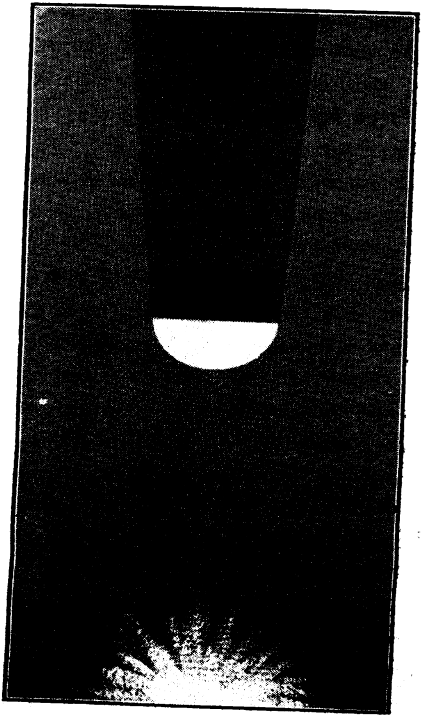
চাঁদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, তাহা বলিতে গিয়া জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে সর্ব্বদাই আছে, তাহা চাঁদের উপরে পড়িলেই গ্রহণ হয়। ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিসেরই উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে, ইহা ত তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। কাজেই চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে,

তখন তাহারো উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে। এই জন্যই গ্রহণের চাঁদে আলো থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে।

পর পৃষ্ঠায় চাঁদের গ্রহণের একটা ছবি দিলাম, এই ছবিটি দেখিলেই চাঁদ কি-রকমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে যায় তাহা বুঝিতে পারিবে। ছবিতে দেখ, সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্যের আলোতে যে ছায়া হইয়াছে, তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চাঁদ এই ছায়ার মধ্যে আছে বলিয়াই চাঁদের গ্রহণ হইয়াছে।

আমরা আগে বলিয়াছি, পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ যখন সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে পারিবে। চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পূর্ণিমা তিথি ভিন্ন অন্য কোনো সময়ে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য্যের মাঝে পড়ে না; কাজেই পৃথিবীর ছায়া এই সময় ভিন্ন অপর কোনো সময়ে চাঁদের উপরে পড়িতে পারে না। অন্য সকল সময়েই পৃথিবীর ছায়া চাঁদের অনেক তফাতে থাকিয়া যায়। কাজেই পূর্ণিমা ছাড়া অপর কোনো তিথিতে চাঁদের গ্রহণ হয় না।

গ্রহণের সময়ে চাঁদখানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে সূর্য্যের একটুও আলো চাঁদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই সময়ে চাঁদকে একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা। কিন্তু পূর্ণগ্রহণের সময়েও চাঁদ একেবারে অন্ধকার হয় না—তামার



চন্দ্রগ্রহণ

মত এক রকম লাল্‌চে অস্পষ্ট আলো তখনো চাঁদে থাকিয়া থাকিয়া যায়। যদি চাঁদের নিজের আলো থাকিত, তাহা হইলে না হয় বলিতাম, এই আলো চাঁদের নিজেরি আলো। কিন্তু চাঁদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুজ্জ্বল। তবে ঐ লাল্‌চে আলোটা কোথা হইতে চাঁদের উপরে পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবী যখন সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের আলো রোধ করে, তখন সব আলোকে সে আট্‌কাইতে পারে না। পৃথিবীর চারিদিকে যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, তাহাই সূর্য্যের একটু-একটু আলো বাঁকাইয়া চাঁদে লইয়া ফেলে। আলো সকল সময়েই সরল পথে অর্থাৎ সোজা পথে যায়, তাহা কখনই বাঁকা পথে চলে না। কিন্তু যখনই তাহা কোনো ঘন বা হাল্‌কা স্বচ্ছ জিনিসের ভিতরে যাইতে চায়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যায়। মহাশূন্য হইতে যে-সব আলোর রেখা সোজাপথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, তাহাও ঐ কারণে স্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়া বাঁকিয়া যায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে সোজা আলোর রেখা-গুলি চাঁদে না পড়িলেও, বাঁকা আলোর রেখার কিছু কিছু চাঁদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের সময়ে চাঁদখানি একেবারে কালো হয় না।

চাঁদে মানুষ আছে কি ?

একে-একে চাঁদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই কিন্তু সব কথা শেষ হইল না। যাহা বাকি রহিল সে-সব খুব জটিল কথা, তোমরা যখন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। এখন তোমাদের হয় ত মনে হইতেছে, চাঁদে পাহাড়-পর্ব্বত আছে, মাটি আছে, সূর্য্যের আলো আছে, জ্যোৎস্না আছে, রৌদ্রের তাপও আছে, তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই ? তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, তোমরাও বুঝি জানিতে চাও, চাঁদে মানুষ আছে কি না।

চাঁদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্তু, গাছপালাও নাই, তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই দেখ, কোনো দিন আমরা যে চাঁদের খবর চাঁদের রাজ্যের লোকের মুখে শুনিব তাহার আশা নাই। সেখানে হিমালয়ের মত উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, এখানকার মত সূর্য্যের আলো আছে, অনেক আগ্নেয় পর্ব্বতও আছে, কিন্তু সেখানে জীবজন্তু বা গাছপালা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় ইস্কুল-কলেজ বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই। জনমানবশূন্য একটা মরুভূমির

মত চাঁদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়া আছে। চাঁদে বাতাস নাই এবং জল নাই, তাহা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। কাজেই সেখানে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টি পড়ে না। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেখানে গাছপালা থাকিতে পারে, তোমরাই একটু ভাবিয়া দেখ। এমন সোনার চাঁদে যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহা হইলে হয় ত আমাদের মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে চাঁদের মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা অন্য কোনো উপায়ে কথাবার্ত্তাও চালাচালি হইত। চাঁদের মাটি-পাথর পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব-জানোয়ারের থাকিবার উপায় নাই। যদি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে চাঁদে লইয়া যায়, তাহা হইলে দম আট্‌কাইয়া আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে; ইহাতেও যদি কোনো গতিকে বাঁচা যায়, তাহা হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল নাই—তরি-তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি খাইয়া বাঁচা যাইবে বল দেখি? তাহার উপরে আবার আগুন জ্বালিবার কোনো উপায় নাই। কারণ একটুও বাতাস নাই; বাতাস না থাকিলে ত আগুন জ্বলে না।

তার পর দেখ, আমরা দু-চার জন যে চাঁদে গিয়া কথা-বার্ত্তা গল্পগুজব করিব তাহারো উপায় নাই; কারণ চাঁদে বাতাস নাই, কাজেই শব্দও হইতে পারে না। তুমি চাঁদে গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, একটুও শব্দ হইবে না;

হাজারটা কামান এক সঙ্গে ছুড়িলেও একটু শব্দ হইবে না। ভাবিয়া দেখ, চাঁদের রাজ্যটা কি ভয়ানক স্থান যুগযুগান্তর ধরিয়া চাঁদের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। কি ভয়ানক অবস্থা! এই জন্যই জ্যোতিষীরা চাঁদকে মৃত উপগ্রহ বলিয়াছেন। এমন সুন্দর চাঁদের এমন দুরবস্থার কথা শুনিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়।

চাঁদের দিবা-রাত্রি

চাঁদের উপরটা পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা একথা তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এ-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাঁদে জীবজন্তু গাছপালা থাকিতে পারে না।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুক্ল পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ হউক, যখনি চাঁদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই আমাদের নজরে পড়ে। এজন্য চাঁদের একটা পিঠে যত পাহাড়-পর্ব্বত ও সাগর-উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল সেইগুলিকেই জানি। চাঁদের অপর পিঠে কি আছে আমাদের জানা নাই। জানা না থাকিলেও, ইহা বেশ বুঝা যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর যেমন এক রকমের, চাঁদের দুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই রকমের।

যাহা হউক চাঁদের একটা পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর দিকে থাকাতে, চাঁদের দিনরাত্রি দুইই খুব বড় হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, ইহাতে ঐ চব্বিশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া চাঁদের একটা মুখই নিজের দিকে

টানিয়া রাখে। এ জন্য চাঁদ যে-সময়ের মধ্যে একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে না। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া এক অমাবস্যা হইতে আর এক অমাবস্যায় আসিতে প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চব্বিশ ঘণ্টা, চাঁদের দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে।

কাজেই মোটামুটি হিসাবে চাঁদের উপরকার প্রত্যেক জায়গায় পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে যখন দিনগুলো একটু বড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও বড় রাত্রির একটিকেও ভাল লাগে না। চাঁদে যদি মানুষ থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন, কত অসহ্য হইত তাহা ভাবিয়া দেখ।

তোমরা ভাবিতেছ, চাঁদে যদি পনেরো দিন ধরিয়া সূর্য্যের আলো ও তাপ লাগে, তাহা হইলে চাঁদের মাটি পাথর তাতিয়া আগুন হইয়া পড়িবে। কিন্তু জ্যোতিষীরা ইহার ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁদের মতে আমাদের পনেরো দিনের মত লম্বা দিনগুলা চাঁদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না। বারো ঘণ্টা মাত্র সূর্য্যের তাপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম হয়, তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চারিদিকের বাতাস এবং

জলের বাষ্প। সূর্য্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্প তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনো জিনিসকে গরম রাখিতে হইলে যেমন আমরা তাহার চারিদিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কাঁথা জড়াই, আকাশের বাতাস ঠিক যেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। বাহির হইতে পৃথিবীতে যে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর আবরণ তাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না ;—এজন্যই পৃথিবী বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে।

কিন্তু চাঁদে ত একটুও বাতাস নাই এবং জলের বাষ্পও নাই, কাজেই সূর্য্যের আলোর সঙ্গে যে তাপ চাঁদের উপরে আসিয়া পড়ে, নিমেষের মধ্যে তাহা চাঁদ ছাড়িয়া আবার মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। কাজেই সকল সময়ে মহাশূন্যের মতই চাঁদ ঠাণ্ডা থাকে। দিনের তাপে চাঁদ যদি এত ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধখানায় পনেরো দিন ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা যে আরো ঠাণ্ডা হইবে, তোমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ।

চাঁদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহাও জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়াছেন। তোমরা জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। মানুষের গায়ের গরম সাড়ে আটানব্বুই ডিগ্রির সমান। সুতরাং সাড়ে আটানব্বুই ডিগ্রির গরম কি-রকম তোমরা আন্দাজ করিতে পার। এই গরম কমিয়া কমিয়া

যখন শূন্য হইয়া পড়ে, তখন কত ঠাণ্ডা হয় এখন ভাবিয়া দেখ। জ্যোতিষীরা বলেন, চাঁদ এত ঠাণ্ডা যে সেখানে থারমোমিটার রাখিলে তাহার তাপ শূন্যের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া যায়। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি চাঁদে একটুও জল থাকিত তাহা হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা পাথরের মত শক্ত বরফ হইয়া দাঁড়াইত না কি? এই রকম চাঁদে কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপালা থাকিতে পারে?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপালা জীবজন্তুকে বাঁচাইয়া রাখিবার মত তাপও চাঁদে নাই।

চাঁদের মৃত্যু

চাঁদ সত্যই মরা জিনিস। দেহের শুষ্ক হাড়গোড় বাহির করিয়া সে ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্ দিয়া বেড়াইতেছে। যেই সূর্য্য আছে, তাই তাহার গায়ে একটু আলো দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভূতের মতই কালো হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত! ভাবিয়া দেখ, চাঁদের কি দুর্গতি! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই!

এখন তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, চাঁদের এই দুরবস্থা কেন? এক কথায় যদি ইহার উত্তর শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি, ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল বলিয়াই—চাঁদের এই অকাল-মৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর সকল জীবজন্তুই ছোট হইয়া জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে বুড়ো হইলে মরিয়া যায়! কিন্তু আকাশের জ্যোতিষ্কদের মধ্যে নিয়ম এই যে, কেহ ছোট কেহ বড় হইয়া জন্মে। যাহারা বড় হইয়া জন্মে তাহারাই বাঁচে অনেক দিন,—শীঘ্র মরে কেবল ছোটরা। চাঁদ পৃথিবীর পুত্র, সে অদৃষ্টের দোষে ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই সে শীঘ্র শীঘ্র বুড়ো হইয়া মরিয়াছে।

চাঁদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে না। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে,

যখন পৃথিবীর উপরটা এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত মাটি-পাথর ইহার উপরে খুঁজিয়াই মিলিত না। বলা বাহুল্য ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। এখনকার পৃথিবী যে-সব জিনিস দিয়া প্রস্তুত তখন তাহা সব একাকারে থাকিয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুরা নয়, ঐ-সব জিনিস গরম বাষ্পের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট সূর্য্যের মত জ্বলিত। কিন্তু পৃথিবী ত আর সূর্য্যের মত বড় নয়, কাজেই কিছু দিনের মধ্যে সে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও তাহার শরীরের বাষ্প জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তখনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। পৃথিবীর দেহ যখন এই-রকম কোমল এবং গরম, তখনি পৃথিবীর দেহ হইতে খানিকটা অংশ খসিয়া গিয়া চাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখ, পৃথিবী নিজের দেহ দিয়াই চাঁদকে গড়িয়াছিল। কাজেই চাঁদকে যদি পৃথিবীর পুত্র বলা যায় তাহা হইলে অন্যায় হয় না।

যাহা হউক চাঁদের মৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি শুন। চাঁদ যখন পৃথিবী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দুইয়ের তাপ সমান ছিল এবং দুজনেই দেহের তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কে শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইবে বলিতে পার কি? চাঁদ আকারে ছোট কাজেই সে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতে লাগিল। এক হাঁড়ি

ভাত যখন উনন্ হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই প্রায় সমান গরম থাকে। কিন্তু যদি এক হাতা ভাত হাঁড়ি হইতে লইয়া একখানা থালায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে হাঁড়ির ভাতের অনেক আগে থালার এক হাতা ভাত ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই-রকমেই পৃথিবীর চেয়ে ছোট চাঁদটিই শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং তাহার সেই বাষ্পীয় দেহ শীঘ্র শীঘ্র তরল হইয়া শেষে জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গলা অবস্থায় ছিল;—তাই চাঁদের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার গলা মাটি-পাথর হাজার হাজার আগ্নেয় পর্ব্বতের আকারে উপরে উঠিত। ইহার পরে চাঁদের ভিতর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে আগ্নেয় পর্ব্বত নিভিয়া গিয়াছিল এবং চাঁদের চারিদিকে তখনো যে-সব হাল্‌কা রকমের বাষ্প ছিল তাহা দিয়া জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাঁদের ভাল সময় ছিল,—তখন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মত চাঁদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল, হয়ত আকাশ-ভরা বাতাসও ছিল। এখন হইতে কত দিন আগে চাঁদের এই সুখের জীবন আসিয়াছিল জানি না,—কিন্তু তখনো আমাদের পৃথিবী যে, ভয়ানক ছিল গরম এবং তাহাতে পশুপক্ষী মানুষ গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয়।

ইহার পরেই যখন চাঁদের সমস্ত দেহ ভিতর পর্য্যন্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, তখনি তাহার সুখের জীবনে

মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গরম না থাকায় সমুদ্রের জল কতক মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বরফ হইয়া পড়িয়াছিল ও কতক চাঁদের দেহের নানা জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাঁদে বাতাস ছিল কিনা জানি না, যদি ছিলই ভাবিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উহাও একটু-একটু করিয়া চাঁদকে ছাড়িয়া মহাকাশের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাঁদের যেমন দেহখানি ছোট, তাহার টানও সেই-রকম অল্প। বাতাসের মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়া রাখিতে পারিবে কেন?

এই-রকমে যখন চাঁদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা জল, আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখনি চঁদের মৃত্যু হইয়াছিল।

পৃথিবীর মৃত্যুভয়

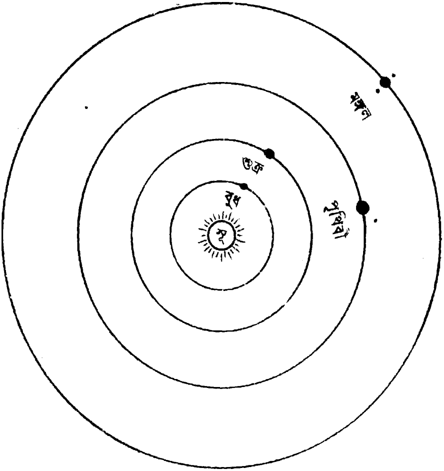
চাঁদ মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু দিনে-দিনে তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পর্য্যন্ত যে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। চাঁদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পৃথিবীরও যে একদিন সেই-রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী সেই মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।

এখনো পৃথিবীর ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার উপরকার অনেক আগ্নেয় পর্ব্বতই নিভিয়া গিয়াছে, দুই চারিটি মাত্র জাগিয়া আছে। কিন্তু কিছুদিন পরে পৃথিবীর সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং আগ্নেয় পর্ব্বতও নিভিবে। পৃথিবীর টানে এখন চাঁদের একটা দিকই যেমন পৃথিবীর দিকে থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই-রকম পৃথিবীরও একটা দিক সূর্য্যের পানে চিরদিনের জন্য তাকাইয়া থাকিবে। একদিকে সূর্য্যের আলো ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্ চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে। তখন পৃথিবীতে জল বাতাস খুঁজিয়া মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী ও মানুষের চিহ্নও ধরাতলে থাকিবে না। থাকিবে কেবল শুষ্ক বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বত এবং জলহীন সমুদ্রের গভীর গর্ত্তগুলি।

চাঁদ মরিয়া গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর ভয় দেখাইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। কারণ কত হাজার হাজার বৎসর পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিথ্যা হইবার নহে,—একদিন তাহা আসিবেই আসিবে।

সূর্য্যের ছোট গ্রহ

পৃথিবীর কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে সূর্য্য ও চাঁদের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবীই সূর্য্যের একমাত্র গ্রহ নয়,—পৃথিবী ছাড়া আরো সাতটি জ্যোতিষ্ক, কেহ কাছে



সূর্য্যের ছোট গ্রহ

কেহ দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা সম্পূর্ণ সূর্য্যের অধীন। সূর্য্যের আলোতে তাহাদের মধ্যে অনেকেই উজ্জ্বল হয় এবং সূর্য্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের

নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, মনে নাই কি ? সূর্য্যের খুব কাছে থাকিয়া ঘুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্র এবং শুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে সূর্য্যকে ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপ্চুন আছে।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্য্যকে মাঝে রাখিয়া যে-রকম পথে ঘুরিয়া বেড়ায় পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। এই সব গ্রহদের পথগুলি কি রকমে সূর্য্যের চারিদিকে সাজানো আছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা বুঝিবে। ইহারা সূর্য্যের রাজ্যের ছোট প্রজা ;—তাই ইহাদের পরিচয়ই আমরা প্রথমে দিব।

বুধ

সূর্য্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বুধই সূর্য্যের খুব কাছে আছে। এজন্য বুধের কথাই আগে বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট। সে যেন সূর্য্যের ছোট ছেলে, তাই সূর্য্য তাহাকে কা -ছাড়া হইতে দেয় না। বুধকে ইংরাজিতে মার্‌কারি (Mercury) বলে।

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ ভালো করিয়া জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখা আছে, বুধ গ্রহটি আমাদের চাঁদেরি একটি পুত্র।

যাহা হউক, বুধ সূর্য্যের খুব কাছে থাকে বলিয়া তাহাকে দেখা বড় কঠিন। সূর্য্যের আলোর সীমার মধ্যে তাহার বসতি, এজন্য ইচ্ছা করিলে যখন-তখন তোমরা বুধকে দেখিতে পাইবে না;—জ্যোতিষীরাও যখন ইচ্ছা উহাকে দেখিতে পান্ না। গ্রহেরা যে পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা ঠিক্ গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বুধ কখনো কখনো সূর্য্যের আলো হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়ে। এই সময়েই পূর্ব্ব বা পশ্চিম আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধ্যায় বুধকে দেখা যায়।

বুধকে খুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো না, ইহা আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোট। চাঁদের উপরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার ঠিক্ মাঝখানে যাইতে হইলে সুড়ঙ্গটিকে প্রায় এক হাজার মাইল গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্য কূয়ো খুঁড়িতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে কূয়োটিকে দেড় হাজার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহা চাঁদের চেয়ে কত বড়।

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় তাহা তোমরা জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাঙিয়া একটা পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে না ভাঙিলে একটা পৃথিবী গড়া যাইবে না। সূর্য্য কি প্রকাণ্ড জিনিস, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি সূর্য্যের সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে একটা হাতীর সঙ্গে একটা মশার তুলনা করা হয়। এক হাত ফাঁকওয়ালা একটা মাঝারি জালাকে যদি সূর্য্য বলিয়া মনে যায়, তাহা হইলে বুধ হইয়া দাঁড়ায় একটি সরিষার আধখানার সমান। সূর্য্যের সন্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়া দেখ।

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় সূর্য্য বুধকে এত কাছে কাছে রাখিয়াছে। সূর্য্যের হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট ছেলেটি হারাইয়া যায়। সত্যই, বুধ যদি বৃহস্পতি শনি

প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে তাহার রক্ষা ছিল না। পৃথিবী যেমন চাঁদকে কাছে রাখিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, উহারাও হয় ত ছোট ভাই বুধকে ঐ-রকমে চিরকালের জন্য ঘুরাইয়া মারিত।

বুধ সূর্য্যের কাছে আছে ; তাই বলিয়া মনে করিও না, সে দশ ক্রোশ বা একশত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ, সূর্য্য হইতে তিন কোটি ষাট্ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে। গ্রহ-নক্ষত্রদের দূরত্বের হিসাবে এই দূরত্ব অতি অল্প, সেই জন্যই বুধকে সূর্য্যের কাছে বলিলাম। কিন্তু আমাদের হিসাবে ঐ দূরত্ব অতি প্রকাণ্ড। যদি তুমি বুধে গিয়া একখানা রেলের গাড়ীতে চাপিয়া সূর্য্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখানা যদি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা হইলে প্রায় তিরাশী বৎসর পরে তুমি সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ যদি বারো বৎসর বয়সে গাড়ী চাপিতে পার, তবে পঁচানব্বুই বৎসর বয়সে তুমি সূর্য্যে পৌঁছিবে। তোমার এখনকার কালো চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা হইয়া যাইবে এবং এমন সুন্দর দাঁতগুলিও পড়িয়া যাইবে।

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, বুধের সে-রকম একটিও চাঁদ নাই। বুধ নিজেই চাঁদের মত ছোট জিনিস,—ইহার আবার চাঁদ থাকিবে কেমন করিয়া ?

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। জ্যোতিষীরা কি রকমে দূরের গ্রহদিগের দূরত্ব

আয়তন ও ওজন ঠিক্ করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জান না। এখন সে-সব হিসাবপত্রের কথা তোমাদিগকে বলিলে, তোমারা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা কি-রকমে বুধের ওজন ঠিক্ করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি কথা একটু বলিব।

তোমরা ধূমকেতু দেখিয়াছ কি ? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা ধূমকেতু কখনো পূর্ব্ব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই-রকম একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে কি ? ধূমকেতু-সম্বন্ধে সকল কথা পরে বলিব। এখন এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবী, বুধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। এই রকমই একটা ধূমকেতু আছে,—তাহার নাম এন্‌কি। এন্‌কি (Encke) নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ধূমকেতুটি সূর্য্যের খুব কাছে থাকিয়া তিন বৎসর তিন মাসে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। রেলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিতে দেরী করে, তুমিও কখনো কখনো ইস্কুলে যাইতে দেরি কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রেরা দেরি কাহাকে বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক্ করা আছে, তাহারা সেই সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে। ঘড়ি শ্লো ফাষ্ট্ যায়, কিন্তু উহাদের শ্লো ফাষ্ট্ নাই।

কিন্তু বহুদিন আগে হঠাৎ একটা ভাবনার কথা হইয়াছিল। যে-দিন এন্‌কির ধূমকেতুকে দেখিবার কথা ছিল, সেদিন এন্‌কি দেখা দিল না। পণ্ডিতদের মহা ভাবনা হইল। সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু হিসাব ত মিথ্যা হইবার নয়! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া তাঁহারা অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। দশ হইতে দুই বাদ দিলে আট বাকি থাকে, তোমরা অঙ্ক কষিয়া ইহা ঠিক করিতে পার। এখন যদি একদিন হঠাৎ দেখা যায় যে, দশ পয়সা হইতে দুই পয়সা খরচ করিলে ছয় পয়সা বাকি আছে, তাহা হইলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাও না কি? তোমরা তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে থাক যে, হিসাবে ভুল হইয়াছে। জ্যোতিষীরা এন্‌কিকে আসিতে না দেখিয়া, এই-রকম অবাক্ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, হয় ত হিসাবে ভুল আছে। কিন্তু ভুল ধরা পড়িল না।

পণ্ডিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিলেন, এন্‌কিকে সূর্য্য টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে; কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তখন শনিই তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে।

জ্যোতিষীরা মহা মুস্কিলে পড়িলেন; আকাশে এন্‌কির খোঁজ করিতে তাঁহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্‌কি দেখা দিল। তাঁহাদের ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু এন্‌কি পথের মাঝে কেন এত দেরি করিল, তাহা ঠিক্ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে

হিসাবে বসিতে হইল। রেলের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌঁছিতে দেরি করে, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার বুঝিয়া লন, পথে তাহার কল বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো মাঝ-ষ্টেশনে আটক্ থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু এন্‌কির কল ত বিগ্‌ড়াইবার নয়;—স্থির হইল, পথে তাহাকে কেহ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল।

যে-পথে এন্‌কি সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতেরা ম্যাপ খুলিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখা গেল, ঐ সময়ে বুধগ্রহ এন্‌কির পাশে ছিল। পণ্ডিতেরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধূমকেতু এন্‌কিকে পথের মাঝে পাইয়া বুধ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু মজা করিয়াছিল, তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব!

যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্‌কির একটু কষ্ট হইলেও জ্যোতিষীদের খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। সে কত দিন দেরি করিয়াছিল তাহা জ্যোতিষীরা জানিতেন। কত জোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাঁহারা অঙ্ক কষিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্থির হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, মোটা মানুষের গায়ের জোর ছিপ্‌ছিপে লোকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। কুস্তিগীর পালোয়ানেরা মোটা নয়। খুব মোটা লোকেরা

এই সব পালোয়ানের সহিত লড়িতে গিয়া প্রায়ই হারিয়া যায়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্য রকম; ইহাদের মধ্যে যে বেশি মোটা তাহার জোরও তেমনি বেশি। কাজেই কোনো গ্রহের টানের পরিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে কত তাহা ঠিক্ করা কঠিন হয় না।

এই রকমেই জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন—একুশটা বুধগ্রহ একটা পৃথিবীর সমান।

এন্‌কির কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল; এখন বুধগ্রহের অন্যান্য খবর তোমাদিগকে দিব।

গ্রহমাত্রেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ—সূর্য্যকে একবার পাক দিয়া আসিতে ইহার তিন শত পঁয়ষট্টি দিন অর্থাৎ একবৎসর সময় লাগে। একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও একটা গ্রহ, সে কতদিন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে জান কি? জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন, অষ্ট-আশী দিনে সে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধে যদি প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বৎসর হয় অষ্ট-আশী দিনে। অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় চারি বৎসরের সমান। বুধের রাজ্যটা বড় মজার নয় কি? এখন যদি তোমার বয়স বারো বৎসর হয়, বুধের লোকেরা তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বৎসর।

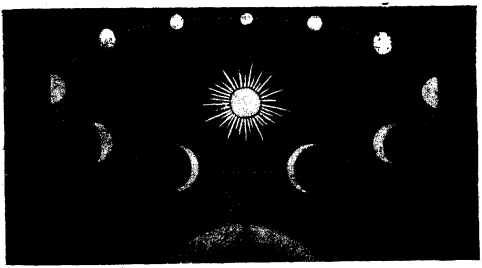
অষ্ট-আশী দিনে একবার সূর্য্যেকে পাক্ দিয়া আসা বড়

সোজা ব্যাপার নয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, এজন্য যে গোলাকার পথে সে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা পৃথিবীর পথের চেয়ে ছোট। কিন্তু তবুও অষ্ট-আশী দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে বুধকে খুব জোরে জোরে চলিতে হয়। এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী কত জোরে চলে, তোমরা বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেণ্ডে উহাকে ঊনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌড়িয়া এক সেকেণ্ডে হয় ত দু'হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার না। কিন্তু পৃথিবী সেই একটুখানি সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্য দৌড়ায় ঊনিশ মাইল! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি বাহির হয়, তাহা এত জোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও জোরে। বুধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েও বেশি;—সে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই-রকমে চলিয়াই অষ্ট-আশী দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। সূর্য্যের চারিদিকে যত ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না। এই জন্যই গ্রীকেরা বুধের নাম দিয়াছিলেন (Mercury) অর্থাৎ "সূর্য্যের দূত!"

অমাবস্যার পরে চাঁদ কেন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া শেষে পূর্ণিমায় সম্পূর্ণ গোল হইয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে আগে বুঝাইয়াছি। বুধ ও শুক্রের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-পথ

পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্য বুধ ও শুক্র দুয়েরই চাঁদের মত ক্ষয় বৃদ্ধি দেখা যায়।

বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। এখানে একটা ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে। ছবির মাঝে সূর্য্য স্থির



শুক্র ও বুধের কলার হ্রাসবৃদ্ধি

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারি চারি পাশে বুধ ঘুরিতেছে। পৃথিবী আছে ইহার ভ্রমণপথের বাহিরে। সূর্য্যের আলো গায়ে লাগায় কি-রকমে বুধের কলার হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে তোমরা এখন ছবি দেখিলেই বুঝিবে।

পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, ইহা তোমরা জান। সে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুর পাক খায় বলিয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ এই-রকম হইয়াছে। প্রাচীন জ্যোতিষীদের জানা ছিল, বুধগ্রহও চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়। কাজেই

তাঁহারা বলিতেন, পৃথিবীতে যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় দিন রাত্রি হয়, বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিষীরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা খুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে দেখিয়া বলিতেছেন, চাঁদ যেমন তাহার একটা পিঠই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া রাখে, সেই-রকমে বুধও তাহার দেহের একটা দিক্ সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া ঘুরিতেছে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধের একটা পিঠেই চিরকাল রৌদ্র পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে। কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে পৃথিবীর মত দিনরাত্রির পরিবর্ত্তন হয় না। উহার একটা দিকে চিরকালের জন্য রাত্রি এবং আর একটা দিকে চিরকালের জন্য দিন হইয়া আছে। বুধগ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, সূর্য্যের উদয় অস্ত নাই, গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তনও নাই। কি ভয়ানক স্থান!

বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের অনেক কাছে আছে, এজন্য সূর্য্যের তাপ ও আলো তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে। আমরা রাঁধা-বাড়া করিবার জন্য কাঠ কয়লা কত কি জ্বালিয়া আগুন করি। কিন্তু বুধে সূর্য্যের তাপ এত বেশি যে তাহাতেই জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে,—আগুন জ্বালার দরকারই হয় না। সেখানে সূর্য্যকে আকারেও খুব বড় দেখায়—বুধগ্রহের সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের প্রায় নয় গুণ বড়।

যেখানে এত গরম এবং যেখানে দিন-রাত্রি, তিথি-মাস

ঋতু-সম্বৎসর কিছুই নাই, সেখানে যে জল নাই, বাতাস নাই, বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশুপক্ষীদের মত প্রাণীও নাই, একথা তোমাদিগকে বলাই বাহুল্য। বুধ চাঁদেরই মত জনপ্রাণিহীন শুষ্ক গ্রহ।

জ্যোতিষীরা বুধের ফোটোগ্রাফ-ছবি তুলিয়াছেন। ছবির স্থানে স্থানে ফাটা ফাটা দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষী-দের মতে ইহা বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার হাজার বৎসর ক্রমাগত সূর্য্যের তাপ পাইয়া বুধের মাটি-পাথর সম্ভবতঃ ঐ-রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে। দূরবীণ দিয়া এই ফাটালগুলিকে চাঁদের সমুদ্রের মত স্পষ্ট দেখা যায়। এই জন্যই জ্যোতিষীরা বলেন, বুধে বাতাস বা অন্য কোন বাষ্প নাই এবং মেঘও নাই,—থাকিলে উহার উপরকার ফাটালের দাগগুলিকে কখনই ঐ-রকম সুস্পষ্ট দেখা যাইত না।

বুধ সূর্য্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব উজ্জ্বল দেখায় না। উহার উজ্জ্বলতা আমাদেরই চাঁদেরই মত। বুধ কেন এত অনুজ্জ্বল তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কালো মাটি বা পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে, তাহাকে কি কখনো উজ্জ্বল দেখায়? কিন্তু সাদা কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্ চক্ করে। বুধের উপরটা সম্ভবতঃ কালো মাটি বা কালো পাথরের মত কোনো জিনিস দিয়া গড়া, তাই সে বেশি সূর্য্যের আলো পাইয়াও বিশেষ উজ্জ্বল হয় না।

শুক্র

বুধ-গ্রহের কথা বলা হইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে হইবে। শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্ (Venus) বলা হয়। বুধগ্রহের পরেই শুক্রের ভ্রমণ-পথ এবং শুক্রের পরেই আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি? হিসাব করিয়া দেখিয়াছি—শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী হইতে চাঁদ যত দূরে আছে, শুক্র তখন তাহারি এক শত গুণ দূরে আসে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহা এত দূরে তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা যায়। কিন্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই আকাশটি নিতান্ত ছোট জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে তাহারা খুবই দূরে দূরে থাকে। এই কারণে দু-মাইল দশ মাইল লইয়া ইহাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়া হিসাবে বসিতে হয়। সেই হিসাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বস্তুই বলিতে হয়।

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয়া শুক্র-সম্বন্ধে অনেক খবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহাকে খুব ভালো করিয়া জানিতেন। এজন্য

আমাদের পুরাণে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকে ইহার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়া লেখা হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে শুক্রগ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে। সেখানে শুক্রকে স্ত্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে।

শুক্রের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের নাম তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া সম্বর নামে এক অসুরকে বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এই অসুরটি ভয়ানক অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় করিয়া চলিত! প্রদ্যুম্নের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া সম্বর ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, প্রদ্যুম্নের জন্ম হইবামাত্র তাহাকে হত্যা করা ব্যতীত নিজেকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ঘরে প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাঁহার শিশু পুত্রটিকে হত্যা করিবার জন্য সম্বর খুব চেষ্টা করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া দিলেন। কিন্তু সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রদ্যুম্নকে রক্ষা করা হইল না। কোন্ এক সুযোগে ছয় দিনের শিশু প্রদ্যুম্নকে সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। সে ভাবিল, প্রদ্যুম্ন বুঝি মরিয়া গেলেন, কিন্তু সমুদ্রের

জলে ডুবিয়াও প্রদ্যুম্নের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের একটা বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ মাছটা প্রদ্যুম্নকে খাইয়া হজম করিয়া ফেলিল; কিন্তু তাহা হইল না। ছয় দিনের শিশু প্রদ্যুম্ন মাছের পেটের ভিতরকার গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে সেখানে বড় হইতে লাগিলেন।

এদিকে এক দিন ঐ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া জেলের মনে খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এত বড় মাছটিকে খাইবে কে? ইহার দামও অনেক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারিটা মুটের মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রয় করিবার জন্য সম্বর অসুরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সম্বর তখন বাড়ী ছিল না,—হয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। সম্বরের বাড়ীতে কেবল তাহার পালিতা কন্যা মায়াবতী ছিলেন। মায়াবতী পরমাসুন্দরী ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন সুন্দরী দেখিয়াই সম্বর তাঁহাকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বর যে প্রদ্যুম্নকে চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাছ বিক্রয় করিতে আসিল, তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলেন,

প্রদ্যুম্ন এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্তু মায়াবতী দরদস্তুর না করিয়া সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া লইলেন। তিনি তাঁহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল,—প্রদ্যুম্ন মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হয় তোমরা জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু সে গল্প তোমাদিগকে বলিতে গেলে, আর জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, ষোলো বৎসর বয়সে প্রদ্যুম্ন সম্বরকে মারিয়া ফেলিলে, ঐ মায়াবতীই শুক্রগ্রহের আকার লইয়া আকাশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জন্মবৃত্তান্ত।

যাহা হউক, শুক্র পৃথিবীর কাছে রহিয়াছে বলিয়া আকাশের ছোট বড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্‌টি শুক্র তাহা চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। আকাশের কোন্ নক্ষত্রটিকে শুক্র বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। যে নক্ষত্রটি প্রতি বৎসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে সেইটি শুক্র। ইহাকে লোকে “সন্ধ্যা-তারা” বা “সাঁঝের তারা” বলে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্য দূরবীণের দরকার হয় না, বা রাত জাগিয়াও বসিয়া থাকিতে হয় না।

তোমরা "শুক-তারা" বা "পোয়াতে তারাকে" দেখিয়াছ কি ? সূর্য্য উঠিবার আগে বা পূর্ব্বের আকাশে ইহাকে দেখা যায়। ইহাও "সাঁজের তারা"র মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে। এই নক্ষত্রটাও শুক্র-গ্রহ।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—এ আবার কি ? তাহা হইলে শুক্রগ্রহ কি দুটা ? শুক্র দুটা নয়,—একটাই। একটি শুক্রই এক সময়ে পশ্চিমে উঠিয়া "সাঁজের তারা" হয় এবং আর এক সময়ে পূবে উঠিয়া "পোয়াতে তারা" হয়। তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বৎসরের যে-সময়ে "সাঁজের তারা" পশ্চিমে উঠে, তখন পূবে "পোয়াতে তারা" উঠে না। আবার যখন "পোয়াতে তারা" পূবে উঠিতে আরম্ভ করে, তখন "সাঁজের তারার" সন্ধান পাওয়া যায় না। একই রাত্রিতে সন্ধ্যায় "সাঁজের তারা" উঠিতেছে এবং শেষ রাত্রিতে "পোয়াতে তারা" উঠিতেছে এমন একটি রাত্রিও তোমরা বৎসরের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না।

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন দুটি যমক ভগিনী,—দুটি প্রায় একই রকমের, পৃথিবী কেবল সামান্য একটু বড়। কিন্তু ইহা ছাড়া দুইয়ের মধ্যে আর বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, কিন্তু শুক্রের একটা ছোট চাঁদও এপর্য্যন্ত খুঁজিয়া

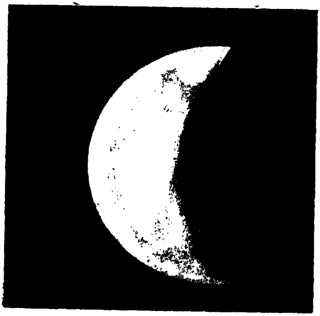
পাওয়া যায় নাই। পৃথিবী সূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া আসিতে তিনশত পঁইষট্টি দিন সময় লয়, কিন্তু শুক্র সূর্য্যকে ঘুরে কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে। অর্থাৎ শুক্রের বৎসরগুলি আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় ঘুরিয়া এখানে দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে, কিন্তু বুধ গ্রহের মত শুক্রের একটা দিকই চিরকালের জন্য সূর্য্যের পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধখানায় কখনো সূর্য্যের আলো পড়ে না। তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন হয় না। যে আধখানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের জন্যই দিন এবং যে আধখানায় এখন রাত আছে সেখানে চিরকালের জন্যই রাত থাকে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবী ও শুক্র চেহারায় ঠিক্ দু'টি যমক বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম সব উল্‌টা।

পর পৃষ্ঠায় শুক্রের দু'খানা ছবি দিলাম। এগুলি দেখিতে ঠিক্ চাঁদের ছবির মত। চাঁদের মত বুধগ্রহের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, ইহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। বুধের ভ্রমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণ-পথ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আছে; এজন্য বুধের মত শুক্রেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে পার, তাহা হইলে অবাক্ হইয়া যাইবে। খালি চোখে যে শুক্রকে একটা



শুক্রের কলা



অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুক্র

আলোকবিন্দুর মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়, তাহাকেই দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট চাঁদের মত দেখায়। যদি সুবিধা পাও, তবে একবার দূরবীণ দিয়া শুক্রকে দেখিয়া লইয়ো।

শুক্রের মত উজ্জ্বল নক্ষত্র সমস্ত আকাশটাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশের যে-সব নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল তাহাদের কুড়ি পঁচিশটা একত্র না করিলে উজ্জ্বলতা শুক্রের সমান হয় না। কিন্তু শুক্রের এত আলো কোথা হইতে আসে। সে পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, এজন্য আমরা সূর্য্য হইতে যে তাপ ও আলো পাই, শুক্র তাহারি দ্বিগুণ তাপ-আলো পায়। কিন্তু তাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জ্বল ? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে সূর্য্যের কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জ্বল দেখায় না ?

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে জ্যোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ভাল উত্তর তাঁহাদের কাছে পাওয়া যাইত না। কেহ বলিতেন, সূর্য্য যেমন তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি নিজে তাপ-আলো দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীরা বুড়ো জ্যোতিষীদের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা দেখিয়াছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও চাঁদেরই মত জিনিস, সুতরাং তাহার নিজের আলো নাই ! সূর্য্যের আলো গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়।

সকল গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় তাহা আধুনিক জ্যোতিষীরাই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই বাতাসে মেঘ ভাসে। সূর্য্যের আলো এই সব সাদা মেঘের উপরে পড়িয়া এত উজ্জ্বল দেখায়। কেহ কেহ আবার একথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আকাশে খুব ঘন বাতাস বা ঐরকমের স্বচ্ছ বাষ্প আছে, এবং তাহাতে ধূলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আলো ঐসব কণার উপরে পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে।

শুক্রের ছবিটা দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাইবে। এইগুলিকেই এক দল পণ্ডিত মেঘের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের উপরকার উঁচুনীচু মাটির চিহ্ন বলা হইয়া থাকে।

শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম। তাহাতে মানুষ বা অপর কোনো জীবজন্তু বাস করে কি না, এখন সেই কথা বলিব। শুক্রের একদিকে চিরকালের জন্য দিন এবং আর একদিকে চিরকালের জন্য ঘোর রাত্রি আছে, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং ইহার অন্ধকার দিক্‌টা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দিক্‌টা যে, মরুভূমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। এইজন্যই জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন,

শুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইয়া অন্ধকারের দিকে জমা হইয়া আছে। আলোর দিক্‌টা গরম, কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাস আকাশের উপর দিয়া ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের বাতাস গরম দেশে আসে, শুক্রেও ঠিক্ তাহাই হয়। ঠাণ্ডা ও গরম বাতাস তাহার দুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে থাকে। চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া যায়।

খুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজন্তুরা বাস করে। তা-ছাড়া খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং ঝড়ে যে জীবজন্তু বাস করিতে পারে না, একথা কখনই বলা যায় না। জল ও বাতাসই জীবের প্রাণ, সেগুলি যখন শুক্রগ্রহে আছে তখন সেখানে জীবজন্তু থাকারই সম্ভাবনা বেশি নয় কি ?

কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না যে, শুক্রে ঠিক্ তোমার আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের গরুর মত গরু আছে। পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত অমিল রহিয়াছে তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই বিধাতা যদি শুক্র-গ্রহে জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি

কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া সৃষ্টি করেন নাই;—শুক্রের অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, যদি তোমরা শুক্রে কি রকম জীব আছে দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানকার জীবজন্তুর আকৃতি-প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজন্তুর হয় ত একটুও মিল দেখিবে না। এক অদ্ভুত সৃষ্টি তোমাদের চোখে পড়িবে। জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালারা বাঁচে না। শুক্রের অন্ধকার দিক্‌টাতেই কেবল জল বরফের আকারে থাকে এবং আলো থাকে তাহার অপর অর্দ্ধেকে। কাজেই বিধাতা যদি শুক্রের গাছপালাকে পৃথিবীর গাছপালার মত শিকড় দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহারা কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং তোমরা যদি শুক্রগ্রহে গিয়া দেখ যে, সেখানকার গাছপালা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িয়া শুক্রের অন্ধকার দিক্ হইতে জল শুষিয়া লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছে, তাহা হইলে উহা দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজন্য সেখানকার কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটুও মিল নাই। কাজেই সেখানকার সৃষ্টির সহিত পৃথিবীর সৃষ্টির মিল না থাকারই কথা। সেই অজানা সৃষ্টি যে কি রকম আমরা তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি না।

মঙ্গল

এবার আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথা বলিব। শুক্রের পথের বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। আগেকার সেই ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে পড়িবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। শুক্র ও মঙ্গল যেন পৃথিবীর দুইপাশের দু'জন প্রতিবেশী। ইহাদের দু'জনের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দূরে। ঘুরিতে ঘুরিতে সে যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল কখনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না।

মঙ্গলকে ইংরাজিতে Mars বলে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন; অঙ্গারক, লোহিতাঙ্গ, যম, কুজ, সম্বর্ত্ত এই রকম অনেক নাম আমাদের পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখা যায়। কিন্তু "মঙ্গল" এই নামটা ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রদের স্থান ইত্যাদি দেখিয়া যাঁহারা মানুষের ভাগ্য গণনা করেন, তাঁহারা মঙ্গলকে ভাল গ্রহ বলেন না। মঙ্গলের স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর, এজন্য ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি অমঙ্গল হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, "মঙ্গল" এই নামটি উহার আদরের নাম। যাহা হউক, গণক ঠাকুরদের কথা

বলিব না। আকাশের বহুদূরের গ্রহেরা এক-একটা মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি-রকমে তাহার অদৃষ্টকে কখনো ভাল, কখনো মন্দ করে, তাহা জানি না।

মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে।

দক্ষ-যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন নাই কি? সতী অর্থাৎ দুর্গার পিতা দক্ষরাজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাঁর সব মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাঁহার স্বামী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। শিব শ্মশানে বেড়াইতেন, বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন, গায়ে ছাইভস্ম মাখিতেন এবং ষাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই-সব দেখিয়া দক্ষরাজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; তাই শিবকে অপমান করিবার জন্যই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সতী স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শিবকে না বলিয়া বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু বাপ তাঁহাকে আদর করিলেন না; উপরন্তু শিবের অনেক নিন্দা করিতে লাগিলেন। বাপের বাড়িতে গিয়া এই-রকম অনাদর হইবে তাহা সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি নিশ্চয়ই শিবের কাছ-ছাড়া হইয়া আসিতেন না। যাহা হউক, স্বামীর নিন্দা শুনিয়া সতী মনে খুব কষ্ট পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙাইবার জন্য খুব চেষ্টা করা হইল কিন্তু সে মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না,—সতীর মৃত্যু হইল।

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার অনুচর ভূত-প্রেত-পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যজ্ঞ-স্থানে আসিয়া হাজির হইলেন! ভূতগুলা ভোজের সব আয়োজন নষ্ট করিয়া ফেলিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত হইলেন। পুরাণে লেখা আছে, এই সময়ে তাঁহার কপাল হইতে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়িয়া এক ভয়ানক বীরপুরুষের উৎপত্তি করিয়াছিল। ভূত-প্রেতেরা দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছিল, কিন্তু ঐ বীরপুরুষটি জন্ম-গ্রহণ করিয়া এক নিমেষে একাই যজ্ঞক্ষেত্রকে শ্মশানক্ষেত্র করিয়া ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। শিব এই বীরপুরুষের নাম দিলেন বীরভদ্র।

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ-যজ্ঞ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,—এক লাফে স্বর্গে উঠিয়া স্বর্গ নষ্ট করিল, আর এক লাফে পাতালে নামিয়া পাতাল পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে পর্য্যন্ত আগুন ধরাইয়া দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের লোকেরা বীরভদ্রের অত্যাচারে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল!

শিব এই-সব দেখিয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন। বীর-ভদ্রের মত পালোয়ানকে ত্রিভুবনের মধ্যে রাখিলে যে, সৃষ্টি লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন। বীরভদ্রের

ডাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি খুবই খুসী হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভুবনে থাকা চলিবে না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে। শিবের আদেশ অমান্য করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ হইবামাত্র, বীরভদ্র একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরাণের মতে এই গ্রহটিই আমাদের মঙ্গল গ্রহ।

তোমরা কখনো মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, সুবিধা মত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধারণতঃ ইহাকে লাল রঙের নক্ষত্রের মত দেখায়,—বোধ হয় এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার "অঙ্গারক" এবং লোহিতাঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকে কখনই শুক্রের মত উজ্জ্বল দেখা যায় না। এই জন্য ইহাকে যখন-তখন চিনিয়া লইতে মুস্কিল হয়। লাল রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই সব নক্ষত্রের মধ্যে মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সে যখন পৃথিবীর নিকটে আসে তখন তাহাকে বেশ চেনা যায়। দূরের জিনিস কাছে আসিলেই বড় দেখায়। এজন্য মঙ্গলকেও ঐ সময়ে বেশ বড় দেখায়; তা'র উপরে আবার লাল রঙ্ থাকে। আকাশে যখন লাল রঙের বড় তারা দেখিবে, তখন জানিবে উহা মঙ্গলগ্রহ।

কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার ঐ রকম সুবিধা সকল বৎসর হয় না। দুই বৎসর অন্তর কয়েক মাসের জন্য যখন উহা পৃথিবীর কাছে আসে, কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় দেখায়। অন্য সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে তোমরা পাঁজি দেখিয়া উহার স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। পাঁজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ঠিক আগেকার পাতায় কোন্ গ্রহ আকাশের কোন্ রাশিতে আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে। রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের যখন পরিচয় হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা তাহাদের মধ্যে গ্রহদের সন্ধান করিতে পারিবে।

মনে কর আমরা বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে মঙ্গলগ্রহকে চিনিবার জন্য পাঁজি দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে ৫ই বৈশাখ মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে। রাশি-চক্রের সহিত যখন তোমাদের পরিচয় হইবে, তখন কর্কট-রাশি আকাশের কোন্ জায়গায় আছে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়াই তোমরা চিনিতে পারিবে। কাজেই এই কর্কট-রাশিতে খোঁজ করিলেই তোমরা মঙ্গলকে দেখিতে পাইবে। নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদিগকে চিনিয়া বাহির করিবার এমন সহজ উপায় আর কোথাও পাইবে না।

যাহা হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্য বিষয়গুলির কথা বলা যাউক।

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এমন কি

শুক্রের চেয়েও ছোট; চারিটি মঙ্গল জোড়া না দিলে একটা পৃথিবী গড়া যায় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর সিকির সমান। ইহার উপরে আবার সে বেশি ভারিও নয়। একটা প্রকাণ্ড দাঁড়িপাল্লার এক দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে নয়টা মঙ্গলকে না চাপাইলে দুইয়ের ভার সমান হইবে না। যে মাল-মসলা দিয়া ভগবান মঙ্গলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়েও অনেক হাল্‌কা।

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও শুক্রের মত ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্য রাত্রি এবং আর এক পিঠে চিরদিনের জন্য দিন নাই। দিন-রাত্রি ঋতু-সম্বৎসর সকলি মঙ্গলে আছে; এই হিসাবে ইহাকে পৃথিববীরই মত গ্রহ বলা যাইতে পারে। এই জন্যই আজকালকার জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্তু গাছপালা এবং মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।

পৃথিবীতে দিন রাত্রি কি-রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার লাট্টুর মত ঘুরপাক খায়, তাই আমাদের দিবারাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু মঙ্গল তাহার মেরু-দণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমাণ আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল কয়েক মিনিট

মাত্র বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বৎসরের সহিত আমাদের এক বৎসরের তফাৎ বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাই আমাদের এক একটা বৎসর ৩৬৫ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল ঐ-রকমে সূর্য্যকে ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক বৎসর আমাদের প্রায় এক বৎসর এগারো মাসের সমান!

সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে মঙ্গল কেন এত বেশি সময় লয়, তোমরা অনুমান করিতে পার কি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত, মঙ্গলের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। এই জন্য মঙ্গলের পথটা পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়া পড়িয়াছে। অল্প রাস্তা চলিতে অল্প সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি সময় লাগে, ইহা তোমাদের জানা কথা। এই জন্যই মঙ্গল সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ-সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা তোমরা জান না কি? সে প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার চেয়ে অল্প বেগে সূর্য্যকে ঘুরে। এই বেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র। কাজেই দেখ, মঙ্গল দু'রকম অসুবিধার মধ্যে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরে,—প্রথমে তাহার রাস্তাটা খুব লম্বা, তার উপরে সে চলে আস্তে আস্তে। এই

দুই কারণেই মঙ্গল এক বৎসর এগারো মাসের কমে সূর্য্যকে ঘুরিতে পারে না।

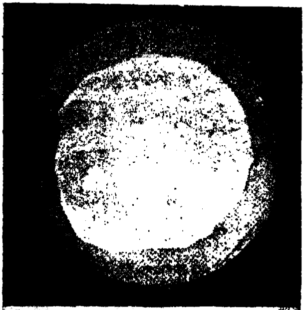
মঙ্গলের চাল-চলন-সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন উহার উপরকার খবর তোমাদিগকে দিব। আমাদের প্রতিবেশী বলিয়া মঙ্গলের অনেক খবরই আমাদের জানা আছে। এখনো দু'এক জন জ্যোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাহার ফটোগ্রাফ্-ছবি তুলিতেছেন, এবং তাহার উপরে কি কি জিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা অল্পদিনের মধ্যে জানিতে পারিয়াছি।

মঙ্গলে বাতাস আছে এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাষ্পও মিশানো আছে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এই জন্য মঙ্গলের উপরকার অনেক জিনিস আমরা দূরবীণ দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাই।

এখানে মঙ্গলের দুইখানি ছবি দিলাম। খুব বড় দূরবীণে মঙ্গলকে যে রকম দেখায়, ছবি ঠিক সেই রকমের। ছবির উপরে যে সাদা দাগ দেখিতেছ, তাহা কিসের দাগ বলিতে পার কি? জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের দুই মেরু-প্রদেশে যে বরফ জমে, ঐ দাগটি তাহারি। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ শীতকালে যেমন বরফে ঢাকা পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক্ সেই রকমে বরফে আচ্ছন্ন হয়।



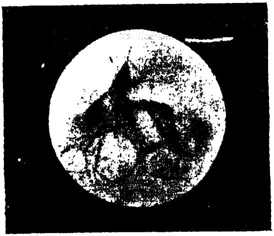
মঙ্গলের বরফ



মঙ্গলে বরফের বন্যা

শীতকালে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ এবং উঁচু পর্ব্বতের উপরে যে বরফ জমে, বসন্ত বা গ্রীষ্মকাল আসিলে তাহা গলিতে আরম্ভ হয় এবং এই বরফ-গলা জলে অনেক নদ-নদী পূর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন্ সময়ে বসন্ত ঋতু আসে এবং কখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, ইহা আমাদের জানা আছে। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া মঙ্গলেরও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর সময় ঠিক্ করিয়াছেন। ইঁহারা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের ছবি উঠাইয়া দেখিয়াছেন, তখন তাহারো দুই মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার উপরকার শত শত খাল দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানে মঙ্গলের আর একখানা ছবি দিলাম। ইহার গায়ে যে-সব রেখা কাটা রহিয়াছে, এইগুলিই খালের চিহ্ন। গ্রীষ্মকালে মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে, বরফের জল এই খাল দিয়া আসিয়া কয়েক মাসের জন্য মঙ্গলকে আমাদের পৃথিবীরই মত সরস করিয়া তুলে। তখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর



মঙ্গলে খালের চিহ্ন

মত গাছপালাও জন্মে। কিন্তু এই সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে ইহাতে জলের চিহ্ন দেখা যায় না। শুষ্ক মরুভূমিতে সূর্য্যের আলো পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মঙ্গলকে সেই রকম মরুভূমির মত দেখা যায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রঙটা, বালির উপরকার রৌদ্রেরই রঙ্।

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হ্রদ ও সমুদ্র আছে, তাহার কোনোটিকে কেহ কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করে নাই। এগুলি আপনা হইতে জন্মে এবং আপনা হইতে বুজিয়া আসে। কিন্তু খাল বিল পুষ্করিণী আমরা মজুর দিয়া বা এন্‌জিন্ দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করি। মঙ্গলের উপরে যে সোজা সোজা খাল দেখা যায়, সেগুলি আপনা হইতে জন্মিয়াছে, কি মঙ্গলের কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, এই কথাটির মীমাংসার জন্য অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীদের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। এক দল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এগুলি মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্তুত। হাতে-গড়া জিনিস না হইলে খালগুলি, এমন সোজা এবং এমন পরিষ্কার হইত না। যাহা আপনা হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা কখনই এমন সিম্‌সাম্ হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে; এজন্য কোনো নদীকে কখনো ঠিক্ সোজা পথে চলিয়া সমুদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নালা নয়,—তাহা মঙ্গলেরই অধিবাসী কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে প্রস্তুত।

আর এক দল জ্যোতিষী এই-সকল কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেখা দেখা যায়, সেগুলি সত্যই সোজা নয়। দূর হইতে মঙ্গলকে দেখি বলিয়া আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং ধাঁধায় পড়িয়া আমরা বাঁকা জিনিসকে সোজা দেখি এবং এলোমেলো জিনিসকে বেশ সিমসাম্ সাজানো দেখি।

মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে দুই দলের কথাই বলা গেল। এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্ উল্‌টা। এখনো দুই দলের মধ্যে বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। এজন্য কোন্ দলের কথা সত্য, এখন তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, মঙ্গলে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তাহারা আমাদের মত সুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টিও হয় না। কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে থাকিতে হইলে জলের জন্য তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যখন একবারমাত্র বরফ-গলা জল আসিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হয় ত তখনি তাহাদিগকে সমস্ত বৎসরের পানীয় জল যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। কূয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, কারণ মঙ্গলের খুব নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। মঙ্গলে চাষ-আবাদ করাও দায়। বরফ-গলা জলের বন্যা আসিলে মঙ্গলবাসীদিগকে তাড়াতাড়ি চাষ-আবাদ করিয়া

বৎসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া সুখের জীবন বলা যায়!

তার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজা রেখাগুলি যদি সত্যই মঙ্গলের খাল হয়, তাহা হইলে খাটিয়া খুটিয়া খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখাও মঙ্গলবাসীদের একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের সমস্ত খালের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত লক্ষ মাইল; এত লম্বা খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখিতে গিয়া মঙ্গলবাসীদিগকে যে-রকম পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না।

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথা জানিয়া জ্যোতিষীরা বলেন, গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য না হইলেও, তাহা ক্রমে চাঁদের মত মরিতে চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুদ্র এবং টানিবার শক্তি অল্প বলিয়া সে বাতাসকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; একটু একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে ছাড়িয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। জলের অবস্থাও তাহাই; —চাঁদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ত্ত আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে,—যখন ইচ্ছা জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, যেদিন অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং

অবশিষ্ট জল মেরুপ্রদেশে জমা না হইয়া মাটির আরো গভীর স্থানে গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তখন শ্মশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের চাঁদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো মঙ্গলের একমাত্র কাজ হইবে।

মঙ্গলের চাঁদ

বুধ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর কাহারো চাঁদ অর্থাৎ উপগ্রহ নাই। মঙ্গল-গ্রহকে শত বৎসর ধরিয়া জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার একটি চাঁদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই জ্যোতিষীরা বলিয়া আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা একাই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে, মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একটা মজার ঘটনা হইয়াছিল। আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষী হল্ সাহেব তাঁর দূরবীণ দিয়া এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়িয়া গেল, ছোট আলোর বিন্দুর মত দুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে রহিয়াছে এবং তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই দুটি যে মঙ্গলের চাঁদ তাহাতে তাঁহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। দেশ-বিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্ সাহেব মঙ্গলের দুটা উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা রাত্রি জাগিয়া দূরবীণ দিয়া

মঙ্গলের চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন। কেবল দেখা নয়, চাঁদ দুটি কত বড় এবং কত দূরে থাকিয়া কতদিনে মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতেছে, এই সব খবর জানিবার জন্যও তাঁহারা কাগজ-পেন্‌সিল্ লইয়া বড় বড় অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জানা গিয়াছিল; তখন জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দিনকতক আরামে ঘুমাইতে পারিয়াছিলেন।

মঙ্গলের চাঁদের কথা শুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, চাঁদ দুটি আমাদের চাঁদের মত বড়। কিন্তু তাহা নয়,—সে দুটি আকারে এত ছোট যে, আমাদের চাঁদের সহিত তাহাদের তুলনাই করা যায় না। আমাদের চাঁদকে যদি একটা মাঝারি গোছের ফুটবল্ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের চাঁদ দুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয়। ভাবিয়া দেখ কত ছোট।

নূতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীরা তাহাদের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে থাকিয়া যে চাঁদটি ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীরা তাহার নাম দিয়াছেন ফোবো (Phobo), এবং যেটা দূরে আছে তাহার নাম হইয়াছে ডাইমো (Diemo)। ইহাদের মধ্যে ফোবো একটু বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় এক শত মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ ফোবোর উপর দিয়া যদি একটা রেল-লাইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে তোমরা

সেখানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে যতটা সময় লাগে, ফোবোকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় লাগে না!

ডাইমো আরো ছোট। ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। তোমরা দু-চার জন যদি ডাইমোতে যাও, তাহা হইলে হাঁটিয়াই তাহার অর্দ্ধেকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে পার।

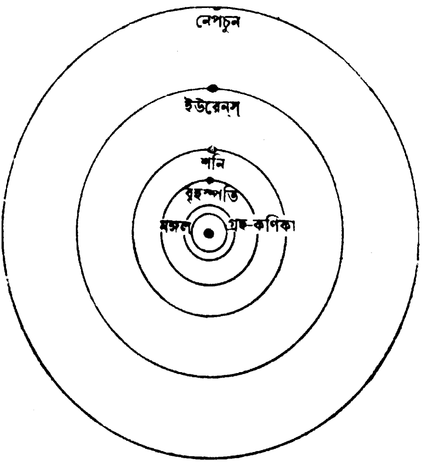
মঙ্গলের চাঁদ দুটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্রী করিয়া গড়িয়াছেন। আমাদের পৃথিবীর এই রকম দুটি চাঁদ থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয় ত ছুটির দিনে সেখানে গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাঁদের দেশের গল্প করিতাম।

মঙ্গলের চাঁদ দুইটির চলাফেরার রকম আরো মজার। আমাদের চাঁদ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাফেরা করে, তাহা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রায় ঊনত্রিশ দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়া আসিতে দেখি। এই সময়ের মধ্যে অমাবস্যা হয়, পূর্ণিমা হয়, ক্ষয়বৃদ্ধি কত কি হয়। কিন্তু মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে "ফোবো" সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাবস্যা পূর্ণিমা, ক্ষয়বৃদ্ধি সবই হইয়া যায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রির

পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের এক দিনে ফেবো তাহাকে তিনটা পাক দিয়া আসে এবং এক একটা পাকে পূর্ণিমা, অমাবস্যা সবই এক একবার হয়। সুতরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফেবোর দুইটা করিয়া পূর্ণিমা হয়। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা অন্তর এক-একটা পূর্ণিমা,—বড় মজার ব্যাপার নয় কি?

কেবল ইহাই নয়;—ফোবোর গতিবিধিও বড় অদ্ভুত। যে-সময়ে মঙ্গল নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিন-রাত্রি দেখাইতে থাকে, সে সময়ে ফোবো মঙ্গলকে তিনবার ঘুরিয়া আসে। মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরপাক্ খায় ফোবোও ঠিক সেই দিক্ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে তাহা হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাঁড়াও, তবে ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্ব্বমুখে দৌড়িতে দেখিবে। সেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি না থাকে, তবুও এই চাঁদটির ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য মঙ্গল-লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এমন মজার চাঁদ বোধ হয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের চাঁদের মত পশ্চিম আকাশে উদিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে তখন বোধ হয়, যেন একখানা ঘুঁড়ি শীঘ্র শীঘ্র আকাশের উপরে উঠিতেছে। তার পরে যখন মাথার উপর দিয়া চলিয়া পূর্ব্বে হেলিতে আরম্ভ করে তখন বোধ হয় যেন সে মাটিতে আছাড় খাইবার জন্য ফানুসের মত নামিতেছে।

মঙ্গলের অপর চাঁদ "ডাইমো" এতটা চঞ্চল নয়। প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর উহার পূর্ণিমা হয়। ইহাও বড় কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই এই চাঁদটির পূর্ণিমা হয়। আবার এরকমও এক এক রাত্রিতে দেখা যায় যে মঙ্গলের দুটা চাঁদই আকাশের এক জায়গায় আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং দুটারই পূর্ণিমা হইয়াছে। এই রকম ডবল্ চাঁদের ডবল্ পূর্ণিমা অদ্ভুত নয় কি? মঙ্গলে যদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছু না হউক সেখানকার এই চাঁদ দুটিকে দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পায়। আমাদের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিগুলার মত মঙ্গলের রাত্রিতে কোনো তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; কখনো একটা এবং কখনো দুটা চাঁদ একত্র আকাশে থাকিয়া সেখানে খুব জ্যোৎস্না দেয়। মঙ্গলের রাজ্যে সবই অদ্ভুত!



বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথ

সূর্য্যের বড় গ্রহ

একে-একে আমরা সূর্য্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের খবর তোমাদিগকে দিলাম। এখন বড় গ্রহদের কথা তোমাদিগকে বলিব।

বড় গ্রহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি? মঙ্গলের ভ্রমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ ও নেপ্চুন নামে যে চারিটি গ্রহ পরে-পরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকেই আমরা বড় গ্রহ বলিতেছি। সত্যই ইহারা আকারে খুব বড়। তা ছাড়া সূর্য্য হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়া তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়।

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমরা দেখিতে পাইবে। মঙ্গলের পর বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং সকলের শেষে ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের পথ। নেপ্চুন্ সকলের চেয়ে দূরে, তাই ইহার পথটাও সব-চেয়ে বড়।

গ্রহকণিকা

বড় গ্রহদের কথা বলিবার পূর্ব্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড শূন্য জায়গা আছে, তাহার কথা তোমাদিগকে একটু বলা দরকার। ছবি দেখিলে বুঝিবে এই জায়গাটা নিতান্ত অল্প নয়। মঙ্গলের বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাঁকের মধ্যে থাকিয়া অনায়াসে সূর্য্যকে ঘুরিতে পারিত। সূর্য্যের অধিকারের মধ্যে তবে এমন একটা শূন্য জায়গা কেন থাকিয়া গেল?

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, দুই শত তিন শত বৎসর আগে বড় বড় পণ্ডিতেরা পরস্পরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বলিতেন, ঐ ফাঁকে একটা কিছু আছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না। কেহ বলিতেন, বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝা দায়,—কেন এমন একটা ফাঁকা জায়গা আছে তাহা স্থির করা আমাদের অসাধ্য। কিন্তু যাঁহারা গুণী লোক, তাঁহারা ভাবিতেন, ঐ জায়গায় একটা কাণ্ড-কারখানা কিছু আছেই আছে। তাই তাঁহারা অবকাশ পাইলেই দূরবীণ্ দিয়া সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন।

গুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল। ইংরাজি ১৮০০ সালের ১লা জানুয়ারি পিয়াজি (Piazzi) নামে এক ইটালি দেশের জ্যোতিষী খুব বড় দূরবীণ্ দিয়া ঐ ফাঁকা জায়গাটা

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দূরবীণের মধ্যে একটি ছোট গ্রহের মত তারা ধরা পড়িয়াছিল। নক্ষত্রেরা আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহেরা সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিবার জন্য চলা-ফেরা করে। নূতন নক্ষত্রটি গ্রহদের মত নড়াচড়া করে কি না দেখিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান পরিবর্ত্তনও ধরা পড়িয়াছিল। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ্ (Ceres) নামে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে আবার আর একটি ছোট গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। পরে-পরে একই রকমের দুটি গ্রহের আবিষ্কার হইলে জ্যোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, ঐ জায়গায় নিশ্চয়ই আরো অনেক গ্রহ আছে। যাঁহাদের বড় দূরবীণ্ ছিল, তাঁহারা সকলেই নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে আবার দুটি গ্রহের আবিষ্কার হইল। এই রকমে সেই ফাঁকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এগুলিকে ছোট গ্রহ বলিতেছি বলিয়া তোমরা বোধ হয় ত ভাবিতেছ ইহা বুধের মত বা চাঁদের মত ছোট। কিন্তু তাহা নয়। ইহারা এত ছোট যে কতকগুলি আকারে মঙ্গলের চাঁদের মত। ইহাদের মধ্যে যে দুই একটিকে বড়

বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় দুই শত বা তিন শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একটা নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় এবং বাঁধা সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে বলিয়াই ইহাদিগকে গ্রহ বলা হয়; তাহা না হইলে এগুলিকে উল্কা-পিণ্ড বা অপর কিছু নাম দেওয়া যাইত। এই জন্যই আমরা এই ছোট গ্রহদিগের নাম "গ্রহকণিকা" রাখিয়াছি।

দুইপাশের দুটা বড় গ্রহের মাঝে গ্রহকণিকারা কি প্রকারে আসিল, ইহা বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। এ সম্বন্ধে কিন্তু নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেন। আমরা এখানে একজন বড় জ্যোতিষীর কথাই তোমাদিগকে বলিব।

এই জ্যোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকিলেও সেগুলি জমাট বাঁধিয়া এককালে মাঝারি রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক দিন তাহার ভিতরকার গরমে বা বৃহস্পতির টানে গ্রহটির সুগোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছিল। আমাদের পৃথিবীতে কোনো জিনিস ভাঙিয়া মাটিতে পড়িলে, সেটি যেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া যায়। কিন্তু মহাশূন্যে কোনো জিনিস ভাঙিয়া ধূলা হইয়া গেলেও তাহার নিস্তার থাকে না,—ধূলাগুলিও গ্রহের মত ঘুরিতে থাকে। কাজেই সেই অজানা গ্রহের টুকরাগুলিও কোনো স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, ভাঙাচুরা অবস্থায় সূর্য্যকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহকণিকা-

গুলিকে এই রকম কোনো ভাঙা গ্রহের টুক্‌রা বলিয়া জ্যোতিষীরা মনে করিতেছেন।

এ-পর্য্যন্ত যে ছয় শত গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, একত্র করিলে তাহাদের আকার আমাদের চাঁদের অর্দ্ধেকেরও সমান হয় না। এজন্য জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, আকাশের ঐ জায়গায় এখনো হাজার হাজার গ্রহকণিকা আছে। এগুলির মধ্যে যাহারা বড় একে একে হয় ত তাহাদিগকে দেখা যাইবে; কিন্তু যাহারা নিতান্ত ছোট কোনো কালেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

একটা বড় গ্রহ ভাঙিয়াই যে গ্রহকণিকার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দুই একটা লক্ষণও অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। খেলা করিবার সময়ে যখন তোমার মার্ব্বেলটা চারি পাঁচ খণ্ডে ভাঙিয়া যায়,—তখন সেই ভাঙা অংশগুলির আকার কি রকম হয় দেখিয়াছ কি? টুক্‌রাগুলির আকার কি কখনো গোল হয়? কখনই হয় না। কোনোটাকে তিন-কোণা দেখায়, কোনোটা হয় ত লম্বা দেখায়, কিন্তু একটাকেও ঠিক্ গোলাকার দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে দুই একটি ছাড়া আর কোনোটিকে আকার ঠিক্ গোল দেখা যায় নাই। কেহ লম্বা, কেহ তিনকোণা, কেহ চারকোণা এই রকমই দেখা গিয়াছে। কাজেই এগুলি যে কোনো একটি বড় জিনিসের ভাঙা অংশ তাহা উহাদের রকম রকম চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় না কি?

বৃহস্পতি

মঙ্গলের পর গ্রহকণিকাদের অধিকার, তার পরেই বৃহস্পতির রাজ্য। কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা বলিতে হইবে।

জ্যোতিষীরা বৃহস্পতিকে (Jupiter) বলেন "গ্রহরাজ।" বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, সূর্য্যের অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই। ইহার আয়তন এত বড় যে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরো শত গ্রহ উহার পেটের ভিতরে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়া যদি একটি গ্রহ নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেটিও বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়া দাঁড়ায়। ভাবিয়া দেখ বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড! একটা ছোটখাটো সূর্য্য বলিলেই হয়।

মোটা মানুষ প্রায় দৌড়িতে পারে না; মোটা হইয়া পড়ায় বৃহস্পতিরও ঠিক্ সেই দশা হইয়াছে। পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে বৃহস্পতি বারো বৎসর কাটাইয়া দেয়। অর্থাৎ বৃহস্পতির বারো বৎসর আমাদের এক বৎসরের সমান। তোমরা হয় ত বলিবে, যে লম্বা রাস্তা হাঁটিয়া বৃহস্পতি সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা পথে ঘুরে না; তাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।



কথাটা ঠিক বটে ; কিন্তু বৃহস্পতি যদি একটু জোরে দৌড়িতে পারিত, তাহা হইলে সে কখনই বারো বৎসর সময় লইত না। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, কিন্তু বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল করিয়া। এই জন্যই সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিতে পারে। পৃথিবী এই রকমে ঘুরিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজটি সারে। এই জন্য বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড় অল্প। মোটা-মুটী হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন্তু উহার এক এক বৎসর আমাদের বারো বৎসরের সমান।

আমরা এ-পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো নাই। সূর্য্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু বৃহস্পতি-সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা একটা নূতন কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, ইহার নিজেরি হয় ত একটু-আধটু আলো আছে। বৃহস্পতি উপরকার রৌদ্রের আলো পৃথিবীর রৌদ্রের আলোর পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহাকে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। যদি নিজের আলো না থাকিত, তাহা হইলে কেবল সূর্য্যের আলোতে উহাকে এত উজ্জ্বল দেখাইত না।

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওজন কিন্তু বেশী নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, তাহার আয়তন

তেরো শত পৃথিবীর সমান। কিন্তু ওজনের হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, এত বড় জিনিসটা কেবলমাত্র তিন শত পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত ভারি জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়,—ইহাতে খুব হাল্‌কা জিনিসই আছে।

তোমরা দূরবীণ্ দিয়া কখনো বৃহস্পতিকে দেখিয়াছ কি না জানি না। যদি না দেখিয়া থাক, একবার দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে দেখিলে ইহাকে একটা বড় নক্ষত্রের মত দেখায়। নক্ষত্রেরা যেমন একবার নিভিয়া একবার জ্বলিয়া মিট্-মিটে আলো দেয়, কোনো গ্রহই সে রকমে আলো দেয় না। গ্রহদের মূর্ত্তি স্থির, তাহাদের আলোও অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিয়া লইবার এই একটা সহজ উপায়। সুতরাং তোমরা যদি খালি চোখে বৃহস্পতিকে দেখ, তাহা হইলে কখনই তাহাকে নক্ষত্রের মত মিট্-মিট্ করিতে দেখিবে না। কিন্তু খালি চোখে বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড দেহকে এবং সারি সারি চারিটি চাঁদকে খালি চোখে কখনই দেখা যায় না। যদি ছোটখাটো দূরবীণও হাতের গোড়ায় পাও, তাহা হইলে আগে বৃহস্পতিকে দেখিয়ো। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে।

বৃহস্পতিকে দূরবীণে যে রকম দেখায়, এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। দেখ,—তারার মত ছোট বৃহস্পতিকে



বৃহস্পতি ও তাহার চারিটি চাঁদ

কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে যে চারিটি ছোট বিন্দু দেখিতেছ, সেগুলি বৃহস্পতির চাঁদ এবং তাহার গায়ে যে-সব কালো দাগ দেখিতেছ, তাহা বৃহস্পতির মেঘ।

তোমরা মেঘের কথা শুনিয়া বোধ হয় ভাবিতেছ, বৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মানুষ আছে। কিন্তু উহাতে এ-সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভয়ানক গরম রহিয়াছে ;—এত গরম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার অংশ ছাড়া বাকি সকলই আজও গরম বাষ্পের আকারে আছে এবং হয় ত ঐ বাষ্প একটু-একটু জ্বলিতেছে। এই রকম জায়গায় কেমন করিয়া জীবজন্তু থাকিবে? যাহাকে আমরা মেঘ বলিলাম, তাহা ঐ গরম বাষ্প ছাড়া কিছুই নয়।

১৭০ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়াছি। বড় দূরবীণ দিয়া উহাকে যেমন দেখায়, এটা তাহারি ছবি। ইহাতে মেঘগুলিকে তোমরা আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। বৃহস্পতি দশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে,—তাই উপরকার মেঘগুলিকে উহার কোমরবন্ধের মত দেখা যাইতেছে। যদি দূরবীণ দিয়া তোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার মেঘ-গুলিতে চলিতে ফিরিতে দেখিবে।

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ দেখিতে পাইতেছ কি? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ

ভাবিতেছ, কিন্তু মেঘ নয়। জিনিসটা যে কি, তাহা আমিও তোমাদিগকে ঠিক্ বলিতে পারিব না। জ্যোতিষীরাও উহার কথা ঠিক্ বলিতে পারেন নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীরা ভাবিয়াছিলেন, হয় ত উহা একখানা বড় মেঘ। কিন্তু দুই তিন বৎসরেও যখন উহার আকারের কোনো বদল হইল না, তখন তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহা বৃহস্পতির উপরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাষ্প জমাট হইয়া তরল হইয়া যাইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকার একটা দ্বীপ। কেহ বলিলেন, সূর্য্যের বাষ্প-মণ্ডলে যেমন ঝড় হয়, বৃহস্পতিতেও সেই রকম ঝড় হয়, ঐ প্রকাণ্ড দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ন। এই প্রকারে অনেকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্য ব্যাপারটি যে কি, তাহা জানা গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগ দেখা যায়, কিন্তু গত কয়েক বৎসরে উহার রঙ্ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল, এখন সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয়, আর কয়েক বৎসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাইবে না।

বৃহস্পতি-সম্বন্ধে যাহা আমাদের জানা আছে, একে একে তাহার প্রায় সবগুলিই তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু

উহাতে অজানা বিষয় এখনো অনেক আছে। নিজের বৃহৎ দেহটিকে মেঘের আবরণে ঢাকিয়া রাখায় বৃহস্পতি বড়ই মুস্কিল করিয়াছে। কাজেই ভিতরকার খবর আমরা জানিতে পারি নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যখন ইহার সমস্ত মেঘ জমাট বাঁধিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দিবে, তখনি আমরা বৃহস্পতির উপরকার সব খবর জানিতে পারিব।

বৃহস্পতির চাঁদ

বুধ ও শুক্রের চাঁদ নাই; পৃথিবীর চাঁদ মোটে একটি এবং মঙ্গলের দুটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি চাঁদের মধ্যে কেবল চারিটিকে দেখিয়াছ। সাধারণ দূরবীণে এই চারিটিকেই দেখা যায়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দূরবীণের ব্যবহার ছিল না। সেই সময়ে জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির চাঁদের কথা একেবারেই জানিতেন না। ইটালি দেশের বড় জ্যোতিষী গ্যালিলিয়োর নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? ইনিই সর্ব্বপ্রথমে দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির ঐ বড় চাঁদ চারিটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাদুরি কি? একটা দূরবীণ পাইলে সকলেই চাঁদ বাহির করিতে পারিত। কিন্তু তোমরা যদি তাঁর জীবনের কথাগুলি শুন, তাহা হইলে অবাক্ হইয়া যাইবে।

গ্যালিলিয়ো প্রথম জীবনে তোমার-আমার মত সাধারণ লোক ছিলেন। ইটালির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অঙ্ক কষাইতেন এবং বাড়িতে চুপ্‌চাপ বসিয়া দিনগুলা কাটাইতেন। এই সময়ে তিনি এক দিন খবর পাইলেন হল্যাণ্ড্ দেশে একটা আশ্চর্য্য কাচের যন্ত্র বাহির হইয়াছে,—উহা চোখে

লাগাইয়া দেখিলে দূরের জিনিস কাছে বোধ হয়। সব কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে ঐ রকম একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়া গেলেন।

সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ পাওয়া যাইত না। ভাঙা চশ্‌মার পরকলা কাঠের চোঙের মধ্যে পুরিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাজ দেখিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে লাগিল গ্যালিলিয়ো পাগল হইয়াছেন। তাহা না হইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া লোকটা কাচ জোড়া দিয়া সময় কাটাইবে কেন? গ্যালিলিয়ো কিন্তু লোকের হাসি তামাসা গ্রাহ্য না করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার শ্রম সার্থক হইল,—একদিন দেখিলেন তাঁহার কাঠের চোঙের ভিতরকার কাচগুলি দিয়া দূরের জিনিসকে সত্যই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ সেদিন গ্যালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিকে ডাকিলেন এবং রাত্রিতে ঐ যন্ত্র দিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখিতে হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল,—সেদিন পূর্ব্ব-আকাশে বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। গ্যালিলিয়ো তাঁহার প্রথম দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যন্ত্রে একবার মাত্র চোখ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন! বন্ধুবান্ধবেরা অবাক্ হইয়া পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োর পাগলামি

দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রহটিকে আলোর বিন্দুর মত দেখা যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার চারিদিকে চারিটি চাঁদকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ হইতে পারে, গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না,—কিন্তু তোমরা যদি ঐ-রকমে নিজের চেষ্টায় গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমরাও আনন্দে ঐ রকম অধীর হইতে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম একটা বড় আবিষ্কার করায় গ্যালিয়ো দেশের লোকের কাছে এবং রাজার কাছে খুব সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বরং তাঁহাকে নানা রকম অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া যখন গ্যালিয়ো বলিলেন যে, বৃহস্পতি শুক্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেরা পৃথিবীর মত বড় বড় জিনিস এবং চাঁদ সঙ্গে করিয়া তাহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে,—তখন তাঁহারা গ্যালিলিয়োর কথায় কানই দিলেন না। চারিটি চাঁদ বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা দূরবীণ দিয়া দেখাইলেও তাঁহাদের বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—গ্যালিলিয়ো যাদু-মন্ত্র জানেন, তাই তিনি মন্ত্রের জোরে ভেল্‌কি দেখাইতেছেন।

সে-সময়ে যাদু-মন্ত্র দিয়া প্রতারণা করা একটা বড় অপরাধ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। জজ্ সাহেব গ্যালিলিয়োর অপরাধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বিচার

সুরু করিয়া দিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিয়ো সত্যই তাঁর দূরবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া বৃহস্পতির চারিটি চাঁদ দেখাইয়াছেন! চোর ডাকাতের মত গ্যালিলিয়োকে জেলে যাইতে হইল।

দেখ গ্যালিলিয়োর কি দুরদৃষ্ট! জেলে যাইবার সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন,—দূরবীণে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা সত্য। সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং গ্রহেরা তাহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে!

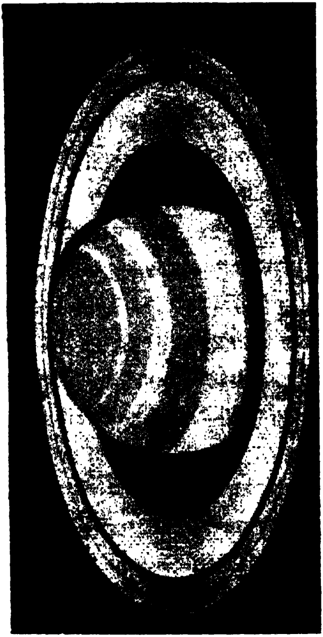
সত্য কথা বেশি দিন ঢাকা থাকে না। জেল হইতে গ্যালিলিয়ো খালাস পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। ইহার পর হইতে পৃথিবীর লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব সম্মান দেখাইয়াছিল।

বৃহস্পতির যে চারিটি চাঁদকে লইয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে* এত কাণ্ড হইয়াছিল, তোমরা ছোট দূরবীণ হাতে পাইলেও একবার তাহাদিগকে দেখিয়ো। তোমরাও গ্যালিলিয়োর মত আনন্দ পাইবে। আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তখন একবার বৃহস্পতির চাঁদ দেখিয়াছিলাম,—তার পরে এই বুড়ো বয়সে সেগুলিকে অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু যখনি দেখিয়াছি তখনি অবাক্ হইয়াছি। আমাদের কাছ হইতে দূরে পৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে এবং তাহার চারিদিকে অনেক গুলি চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় কি?

কেবল ইহাই নয়, দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে পার তাহা হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার প্রথম চাঁদটি ঘুরিতে ঘুরিতে দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অন্তর এবং দ্বিতীয় চাঁদটি প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার বৃহস্পতির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। চাঁদগুলির মধ্যে কোনটি কখন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহা ইংরাজি পাঁজিতে (Nautical Almanac) লেখা থাকে। পাঁজির সময়ের সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখা বড় মজার।

আমাদের চাঁদটি কত বড় তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির প্রথম চারিটি চাঁদ আমাদের চাঁদের মত বড় এবং পৃথিবীর চাঁদের মত তাহাদেরো ক্ষয়বৃদ্ধি অমাবস্যা-পূর্ণিমা আছে।

বৃহস্পতির বাকি চারিটি চাঁদ খুবই ছোট। ভাল দূরবীণ দিয়াও তাহাদিগকে দেখা দায়। তাই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের কথা জ্যোতিষীরা জানিতেন না। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের বড় দূরবীণটি খাটানো হইলে, তাহা দিয়াই ইংরাজি ১৮৯২ সালে বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই রকমে অল্প দিনের মধ্যে চারিটির বদলে বৃহস্পতির চাঁদ এখন আটটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



শনি গ্রহ

শনি

নামটি শুনিলেই ভয় হয়। শনির দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার আর উদ্ধার নাই। শনি একবার নাকি আদর করিয়া গণেশের দিকে চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা ত তোমরা জান। তাঁহার মাথাটি উড়িয়া গিয়াছিল, শেষে একটা হাতীর মাথা আনিয়া জোড়া দেওয়ায় গণেশ বাঁচিয়া ছিলেন। যাহা হউক, সেই শনিই এখন গ্রহরূপে আকাশে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন, ইহার গতিবিধি উদয়-অস্ত সকলি হিসাব-পত্র করিতেন। কাজেই শনি অতি পরিচিত গ্রহ। হয় ত দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ইহার কথা আমাদের জ্যোতিষীদের জানা ছিল।

বৃহস্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চর্য্য গ্রহ তোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালি-লিয়ো সাহেব তাঁহার নিজের দূরবীণ দিয়া শনিকে প্রথম দেখিয়া যেমন অবাক্ হইয়াছিলেন, তিন শত বৎসর পরে এখনো শনিকে দেখিয়া ঠিক্ সেই রকমেই অবাক্ হইতে হয়। বড় দূরবীণে বুধ শুক্র মঙ্গল বা বৃহস্পতিকে দেখিলে কোনোটিকে চাঁদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় ত ভাঁটার মত দেখায়। কিন্তু শনির আকৃতি ইহাদের কাহারো সহিত মিলে না। দূরবীণে শনিকে কি রকম দেখায়, এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম।

ছবিতে দেখ,—চাকার মত কয়েকটি উজ্জ্বল গোল জিনিস রহিয়াছে এবং তাহারি ফাঁকে ভাঁটার মত শনি গ্রহ দাঁড়াইয়া আছে। চাকাগুলির সহিত শনির আসল দেহের কোনো যোগ নাই,—মাঝে বেশ একটু ফাঁক। দূরবীণ দিয়া কোনো গ্রহকে যদি হঠাৎ এই রকম আকারে দেখা যায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় কি? শনি সত্যই এই রকম আশ্চর্য্য জিনিস। এই রকমটি আর কোথায়ও দেখা যায় না।

আকাশের এতগুলো তারার মধ্যে কোনটি শনি তাহা স্থির করা কঠিন নয়। যাঁহারা তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় তাঁদের মধ্যে কাহারো একটু জ্যোতিষ জানা থাকিলে, কোন নক্ষত্রটি শনি তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি সে-রকম কাহাকেও না পাও, নিজেরাই পাঁজি দেখিয়া শনির সন্ধান করিতে পারিবে। প্রতিমাসে শনি-গ্রহ কোন্ নক্ষত্র-রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকে। কিন্তু খালি চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান। শনির সেই প্রকাণ্ড আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাকা এবং তাহার গোটা দশেক চাঁদ, কিছুই খালি চোখে দেখা যায় না। দূরবীণ না দিয়া দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জ্বল তারার মতই দেখিবে।

যে-সকল জ্যোতিষী শনিকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়া বড়ই

আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চাকা শনির চারিদিকে বেড়িয়া কি রকমে শূন্যে দাঁড়াইয়া থাকে ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এখন অবশ্য এরকম দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আজকালকার জ্যোতিষীরা শনির খুঁটিনাটি অনেক খবরই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই তোমাদিগকে দিব। তোমরা যদি কাছে থাকিতে, তাহা হইলে আমাদের দূরবীণটা দিয়া শনির আশ্চর্য্য আকৃতি তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও তাহার গল্প শুনিয়া তোমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

শনির চাকার কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন উহার আসল দেহটার কথাই বলা যাউক।

আয়তনে শনি নিতান্ত ছোট নয়। বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়, তার নীচেই শনি। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাত-শত তিরাশীটা পৃথিবী জোড়া না দিলে একটা শনিকে নির্ম্মাণ করা যায় না। কিন্তু যে-সব পদার্থ দিয়া শনি প্রস্তুত, তাহা নিতান্ত হাল্‌কা,—আমাদের পৃথিবীর মাটি-পাথরের চেয়েও হাল্‌কা, এমনি কি জলের চেয়েও হাল্‌কা। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবীর দেহের মত জমাট জিনিস কিছুই নাই,—ইহার হয় ত সবই বাষ্প। কিন্তু এই বাষ্প খুব ঘন অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন গরম ছাড়িলে উহা জমাট বাঁধিতে থাকিবে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দূরে আছে তাহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় নয় গুণ দূরে আছে। এত দূরে থাকা সত্ত্বেও দূরবীণ দিয়া শনির গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা ঐ দাগগুলিতে চিনিতে পারিবে। জ্যোতিষীরা বলেন, ঐগুলি উহার মেঘের চিহ্ন। কিন্তু তাই বলিয়া শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত মনে করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাষ্প নয়। সেখানকার মেঘেও বৃষ্টি হয় না,—নানা জিনিসের গরম বাষ্প একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলিয়াও সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে তিনশত পঁইষট্টি দিন সময় লয়। কিন্তু শনি সেকেণ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, তার উপরে উহার পথটাও খুব লম্বা। এই দুই কারণে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার ত্রিশ বৎসর সময় লাগে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শনির এক বৎসর আমাদের ত্রিশ বৎসরের সমান। কিন্তু একটা বিষয়ে শনির জিৎ আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্য আমাদের দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু শনি দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরা শেষ করিতে পারে। তাহা

হইলে দেখ, শনির এক বৎসর আমাদের বৎসরের ত্রিশ গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি, দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দেখিত।

সূর্য্য দূরে আছে বলিয়া শনিতে সূর্য্যের আলো ও তাপ দুইই কম লাগে। হিসাব করিলে দেখা যায়, আমরা যে তাপ ও আলো পাই শনি তাহারি নব্বুই ভাগের এক ভাগ মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, সেখানে কত অল্প আলো, কিন্তু এত অল্প আলোতেই শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই জন্য জ্যোতিষীরা বলেন, সম্ভবতঃ, কেবল সূর্য্যের আলোতেই শনির আলো নয়; ইহার দেহের আগুন হয় ত আজও নিভিয়া যায় নাই। তাই সূর্য্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো মিশাইয়া তাহার এত আলো। বৃহস্পতিকে খুব উজ্জ্বল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও জ্যোতিষীরা এই কথাই বলিয়াছেন।

শনির চক্র

এখন আমরা শনির চাকার কথা বলিব। তোমরা যদি আগেকার ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর তিনটি চাকা সাজানো আছে। গ্যালিলিয়ো যখন তাঁহার নিজের হাতে-গড়া দূরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি চাকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শনির একটা কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। চাকাগুলির খুঁটিনাটি সকল খবর আমরা আজকালকার জ্যোতিষীদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। বড় বড় দূরবীণ দিয়া বহুকাল শনিকে দেখিয়া এবং কত হিসাবপত্র করিয়া তাঁহারা শনির চাকার খবর বাহির করিয়াছেন।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিসাবপত্রের দরকার কি? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিয়া গড়া হয়, শনির চাকা না হয় মাটি-পাথর দিয়া গড়া। তার জন্য আবার হিসাব-পত্র কেন? তোমরা যেমন ভাবনা চিন্তা কর, জ্যোতিষীরা সে-রকম চিন্তা করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। চাকাগুলি কি রকমে শূন্যে দাঁড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া কেন শনিব উপরে গিয়া পড়ে না,—এই

সব বিষয় তাঁহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব-পত্রের কথা বলিব না। যখন বড় বড় অঙ্কের বই পড়িবে, তখন ঐসব হিসাবের কথা জানিতে পারিবে। জ্যোতিষীরা বলেন, শনির চাকাগুলি কখনই মাটি-পাথরের মত জমাট জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছোট-বড় জড়পিণ্ড দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক্ খাইতেছে; আমরা দূর হইতে সেই জড়পিণ্ডগুলিকেই নিরেট চাকার মত দেখি।

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, তোমাদের গ্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন দলে দলে কাক চিল প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক দলের পর আর এক দল সার্কাসের ঘোড়ার মত এক গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন একটুও ফাঁক নাই। দূর হইতে এই পাখীর দলকে তোমরা কি রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ। কাক-চিলদিগকে তোমরা কখনই পৃথক পৃথক দেখিতে পাইবে না,—মনে হইবে যেন একটা কালো নিরেট্ চাকা মন্দিরকে ঘিরিয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া আছে।

আমরা শনির চাকাকে ঠিক্ ঐরকমেই নিরেট বলিয়া মনে করি। কোটিকোটি জড়পিণ্ড কাক-চিলদের মত

ঘুরিতেছে, কাজেই আমরা দূর হইতে সেগুলিকে নিরেট চাকার মত দেখিতেছি।

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, সুতরাং বলা যাইতে পারে ঐ জড়পিণ্ডগুলি তিনটা পৃথক্ পথে গাদাগাদি করিয়া চলিয়া তিনটি চাকার সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোতিষীরা ঠিক এই কথাই বলেন।

তোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, যে-সকল পিণ্ড শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের কাছে এই প্রশ্নের ঠিক্ জবাব পাওয়া যায় না; কারণ এখনকার খুব বড় দূরবীণেও চাকার পিণ্ডগুলিকে পৃথক পৃথক দেখা যায় নাই। তবে সেগুলি যে, খুব ছোট জিনিষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের ফুট্‌বলগুলির মত বড় হইতে পারে এবং ক্রিকেট্ খেলার বলের মত ছোট হইতেও পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট চাঁদের মত অবিরাম শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা।

শনির চাঁদ

যেমন শনি তার চাঁদও তেমনি। দশটা চাঁদ তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। কয়েক বৎসর আগে আমরা ইহার কেবল আটটি চাঁদের কথাই জানিতাম। অতি অল্প দিন হইল, বাকি দুটা চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যে চাঁদটি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান্ (Titan)। ছোট দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা শনিকে দেখ, তাহা হইলেও শনি হইতে একটু দূরে ইহাকে দেখিতে পাইবে। টাইটান্ নিতান্ত ছোট বস্তু নয়;—আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়। আকারে সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ হইতে প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সে ষোল দিনে এক একবার শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি চাঁদগুলির অনেকেই টাইটানের চেয়েও দূরে দূরে আছে; আবার দুই-একটা কাছেও আছে। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোট।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সূর্য্যের রাজ্যে গ্রহ-উপগ্রহেরা একটুও এলোমেলোভাবে চলা-ফেরা করে না। সূর্য্যকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবী যে পাকে ঘুরে, নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও সে ঠিক্ পাকেই ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন্ পাকে

ঘুরিতেছে যদি পরীক্ষা করা যায়, সেখানেও ঐরকম ঐক্য দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের প্রত্যেকেই ঠিক সেই পাকে ঘুরে। কেবল ইহাই নয়, উপগ্রহদের চলাফেরাতেও তোমরা ঠিক্ ঐ নিয়মই দেখিতে পাইবে। এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন,—সূর্য্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ তাহার প্রজা। সূর্য্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এক পাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।

রাজার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে না, এরকম একটি ক্ষুদ্র প্রজাকে যদি তোমরা এই সুশাসিত সূর্য্যের রাজ্যে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমাদের কি মনে হয়? তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর,—সে অন্য কোনো রাজ্য হইতে এই রাজ্যে নূতন আসিয়াছে। তাই সে দেশের নিয়ম-কানুন জানে না। সম্প্রতি শনির চাঁদগুলির মধ্যে এই রকম একটি আনাড়ী চাঁদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাঁদ যে পাকে শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক্ তাহার উল্টা পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বড়ই মজার চাঁদ নয় কি? এই ব্যবহার দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে ছিল না। মহাকাশের কোন্ এক অজানা রাজ্যে হয় ত সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; শনি কোনো একদিন কাছে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্যই সে সূর্য্যের রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলে না।

যাহা হউক, দশটি চাঁদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, বোধ হয় সমস্ত সূর্য্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলেই তাহা দেখা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পাঁচটি বড় বড় াদের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি অপূর্ব্ব চাকা আছে। এইগুলি সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া আকাশটিকে যে কত সুন্দর করে তাহা আমরা মনেই ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও অন্ধকার থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা এত চাঁদের আলো ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সেখানে নাই। শনি আজও ভয়ানক গরম রহিয়াছে,—তাহার দেহটি হয় ত আগাগোড়াই বাষ্প দিয়া নির্ম্মিত; সেখানে পা রাখিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে জীবজন্তু গাছপালা কিছুই নাই।

ইউরেনস্

বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত যে ছয়টি গ্রহের কথা তোমাদিগকে বলিলাম, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষীরা কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন ; শনির পরে ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুন নামে যে দুটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খুব জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন ; তা'ছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজাতিও জ্যোতিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্ ও নেপ্‌চুনের কথা ইঁহাদেরও জানা ছিল না ; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের পুঁথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেখা থাকিত। প্রাচীনকালে দূরবীণ ছিল না, এইজন্যই যে-সব দূরের গ্রহ-উপগ্রহকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাঁহারা সেগুলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দূরবীণ হাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীরা ইউ-রেনসের মত দূরের গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন।

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্ উইলিয়ম্ হার্সেল্ নামে ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্‌কে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড়

দূরবীণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দূরবীণেই ইউরেনস্ ধরা দিয়াছিল।

হার্সেল্ সাহেবের জীবনের ঘটনা এবং তাঁহার ইউরেনস্ আবিষ্কারের কথা বড়ই আশ্চর্য্য। নানা অসুবিধার মধ্যে থাকিয়া কেবল নিজের চেষ্টায় হার্সেল্ যেমন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই।

হার্সেল্ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় তাঁহার লেখাপড়া করা হয় নাই। গরিব বাপ কেমন করিয়া স্কুলের বেতন এবং বইয়ের খরচ জোগাইবেন? সেজন্য তিনি এক সৈন্যের দলে চাকুরী লইয়াছিলেন। তিনি বেশ গান-বাজনা করিতে পারিতেন, ঐ সৈন্যের দলে ব্যাণ্ড বাজানো তাঁর কাজ ছিল, হয় ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় ফ্লুট্ বাজাইতেন।

যাহা হউক প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপের হানোভারদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বাধিয়াছিল, তখন হার্সেল্‌কে লড়াইয়ে যাইতে হইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে সৈন্যদের সকলকেই খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। হয় ত দুদিন খাওয়াই হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় না; শীতে বৃষ্টিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। সৈন্যদের সঙ্গে যাইতে যাইতে হার্সেল্ একদিন রাত্রিতে অবসন্ন হইয়া মাঠের মাঝে এক নর্দ্দামার মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু শীতে হিমে তাঁর ঘুম হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

সংসারের বিশেষ কোনো কাজে না লাগিয়া তাঁহার জীবনটা কি এই রকমেই শেষ হইবে ? স্থির করিলেন, সৈন্যদের সহিত তিনি থাকিবেন না। যখন দলের লোকেরা সেই খোলা মাঠে শুইয়া ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হার্সেল্ সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি পলাইয়া যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈন্যেরা জানিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তখন কেহ কিছু জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া হার্সেল্ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

বাড়িতে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাপ মা হার্সেল্‌কে লইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ঠিক্ হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্জ্জায় তিনি হার্‌মোনিয়ম্ বাজাইবেন এবং ইহারি জন্য মাসে মাসে কিছু বেতন পাইবেন। হার্সেল্ কাজে লাগিয়া গেলেন;—গির্জ্জায় হার্‌মোনিয়ম্ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান বাজনা শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখনো কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বৎসর পরে পৃথিবীর সেরা পণ্ডিত হইবেন।

গান বাজনাকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় ত ভাবিয়া থাক, গলায় সুর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়;

কিন্তু তা' নয়। গানের উঁচু-নীচু সুর নানা রকমে মিলাইয়া যন্ত্রে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব-পত্রের দরকার হয়। হার্সেল্ যখন গানের ওস্তাদ হইলেন, তখন তাঁহার এই রকম হিসাব-পত্রের জ্ঞান ছিল না। তিনি খুব অঙ্ক কষিতে লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিলেন; এই সময়েই তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজর গেল। অঙ্ক কষিতে কষিতে তিনি গ্রহ উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় বুঝিতে আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়া ফেলিলেন।

আকাশে এখনো দেখিবার শুনিবার অনেক বিষয় রহিয়া গেল, সেগুলিকেও দেখিবার জন্য হার্সেলের ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু দেখিবেন কি করিয়া, দূরবীণ কোথায় পাইবেন? সেকালে দূরবীণের দাম অত্যন্ত বেশি ছিল, গরিব হার্সেল দূরবীণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে পাইবেন?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্সেল্ ঠিক্ করিলেন নিজের হাতে দূরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবার উপায় হইবে না। তিনি দূরবীণ প্রস্তুতে লাগিয়া গেলেন। নিজের হাতে কাচ ঘসিয়া কাঠ কাটিয়া দূরবীণের আয়না ও চোঙ্ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই সময়টা তাঁহাকে বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল। দূরবীণের কাজে লাগিয়া আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্য গির্জ্জায় ডাক

পড়িলে তাঁহাকে ছুটিয়া সেখানে যাইতে হইত। গান-বাজনার মধ্যে যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছুটিয়া বাড়িতে আসিয়া দূরবীণের কাজে লাগিয়া যাইতেন। এই রকমে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল; মনে হইতে লাগিল, দূরবীণ প্রস্তুত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে না দেখিলে তাঁহার যেন শান্তি নাই।

অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় দূরবীণ নির্ম্মিত হইল। জ্যোতিষের পুস্তকে গ্রহ-চন্দ্রের আকার-প্রকারের কথা যেমন পড়িয়াছিলেন তাহাই চাক্ষুষ দেখিতে পাইয়া হার্সেল্ অবাক্ হইয়া গেলেন। গ্রহ-চন্দ্র-তারার পরিচয় লইতে এই রকমে তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতেন; পাশে তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া থাকিতেন, কোন্ নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখা যাইতেছে, ভগিনী তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ভয়ানক শীত,—বরফ পড়িতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে, তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না,—গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে দেখিতে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।

এই রকমে জ্যোতিষের আলোচনা করিতে করিতে হার্সেল্ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্রেরা পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোশ দূরে আছে। খুব বড়

দূরবীণেও তাহাদিগকে নিকটে আনা যায় না। এজন্য দূরবীণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র; শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগকে দূরবীণে যেমন ভাঁটার মত বড় দেখায়, কোনো নক্ষত্রকে সে রকম দেখা যায় না। কিন্তু হার্সেল্ যে নক্ষত্রটিকে দেখিতেছিলেন, দূরবীণে তাহাকে বেশ বড় দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, পাঁজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে সেই অংশে যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা দেখিলেন না। হার্সেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহ? গ্রহেরা দিবারাত্রি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া থাকে। নূতন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায় কিনা দেখিবার জন্য দুই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল সেটি একটু একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হার্সেল ইহা দেখিয়া আরো অবাক্ হইয়া গেলেন।

এই রকমের একটা বড় আবিষ্কারের খবর ত আর চাপা দিয়া রাখা যায় না। হার্সেল দেশের বড় বড় জ্যোতিষ-দের কাছে খবর দিলেন যে, একটা নূতন গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে।

হার্সেল্ তখনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজনা করাই

তাঁর তখনো ব্যবসায় ছিল। এই রকম একটা লোকের কথায় কি কেহ কখনো বিশ্বাস করে? তাই অনেকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কেবল দুই-একজন জ্যোতিষী মজা দেখিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হার্সেল কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন গ্রহ দেখাইলেন। তাঁহাদের মুখ গম্ভীর হইয়া পড়িল এবং সকলেই বুঝিলেন, ইহা একটা নূতন গ্রহই বটে।

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর গেল, ইংলণ্ডের একজন সঙ্গীত শিক্ষক একটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন। পৃথিবী সুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের তখনকার রাজা তৃতীয় জর্জ্জ হার্সেলকে রাজবাড়ীতে ডাকাইয়া দূরবীণ দিয়া নূতন গ্রহটিকে দেখিলেন। ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী দুইজনেই অনেক রাজ-সম্মান পাইলেন। শেষে এই সঙ্গীত-শিক্ষকই ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক তাঁর জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হার্সেল সাহেব ঐরকমে যে গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই আমরা ইউরেনস্ বলিয়া থাকি।

বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের নামকরণ করেন। ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় না।

কিন্তু হার্সেলের নূতন গ্রহের নামকরণে বেশ একটু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। হার্সেলের ইচ্ছা ছিল, গ্রহটির নাম ইংলণ্ডের রাজা জর্জ্জের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি উহার "জর্জ্জিয়ম্" নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের জ্যোতিষীরা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপর্য্যন্ত প্রাচীন দেবতাদের নামেই হইয়া আসিতেছে, অতএব নূতন গ্রহের নাম রাজার নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়া বোধ কোন ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয় নাই; কিন্তু সূর্য্যের এই নূতন ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্য সভা হইল, কত পরামর্শ হইল, জ্যোতিষীদের কত বক্তৃতা হইয়া গেল; এবং শেষে তাহাকে "ইউরেনস্" নামেই ডাকা স্থির হইল।

অতি অল্প দিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না এটা নিতান্ত ছোট গ্রহ। অমোদের কাছ হইতে সূর্য্য কত দূরে আছে, তাহা তোমরা জান। ইউরেনস্ পৃথিবী হইতে তাহারি আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দূরে আছে বলিয়াই সে এতদিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। আকারে সে পঁইষট্টিটা পৃথিবীর সমান। কাজেই ইহাকে ছোট গ্রহ বলা যায় না। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে গরম বাষ্পই অধিক আছে বলিয়া ইহার ওজনটা খুব বেশি নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে চোদ্দটা পৃথিবীর সমান।

তোমরা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, সূর্য্য হইতে যাহারা বেশি দূরে থাকে, তাহাদের সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথও বেশি লম্বা হয়। ইউরেনাস্ শনির বাহিরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিতেছে, এজন্য শনির চেয়ে অধিক পথ না চলিলে সে সূর্য্যকে চক্র দিয়া আসিতে পারে না। তার উপরে সে চলেও বড় ধীরে ধীরে। পৃথিবী চলে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া, কিন্তু ইউরেনাস্ সেকেণ্ড চারি মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই-সব কারণে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে সে চুরাশী বৎসর কাটাইয়া দেয়। তাহা হইলে দেখ, ইউরেনাসের এক বৎসর আমাদের চুরাশী বৎসরের সমান।

বৎসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলা খুব ছোট। ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চব্বিশ ঘণ্টায়, ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় ঘণ্টায়।

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মজা আছে। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সূর্য্যের রাজ্যে যত ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘুরে। অর্থাৎ সকল ঘড়ির কাঁটাই যেমন বাঁ দিক হইতে ডান দিকে চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা সেই রকমেই এক পাকে চলা-ফেরা করে। কিন্তু ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন

নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম মানিয়া চলে না। সে ঠিক উল্টা পাকে ঘুরপাক খায়। ইউরেনসের এই সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারে পণ্ডিতেরা কিছুদিন চিন্তিত ছিলেন। এখন ইহার একটা কারণ জানা গিয়াছে।

ঘড়ির কাঁটা যে, বাঁ হইতে ডাইনে যায়, ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কাঁটা দুটিকে তোমরা যদি ঘড়ির পিছন হইতে চলিতে দেখ, তবে তাহাদিগকে কোন্ দিকে পাক্ খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি? এই অবস্থায় তোমরা উহাদিগকে ডাইন হইতে বাঁয়ে ঘুরিতে দেখিবে না কি? ইউরেনস্‌কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, তাহারও কারণ ঐ। ইউরেনস্ পৃথিবীর তুলনায় এমন অবস্থায় আছে যে, তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উল্টা দেখি মাত্র, কিন্তু সত্যই সে উল্টা পাকে ঘুরে না।

এই-সকল খবর ছাড়া আমরা ইউরেনস্ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানি না। যে গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দূরে আছে, তাহার খবর ইহার বেশি জানাও সম্ভব নয়। সূর্য্য আমাদের কাছ হইতে এত দূরে থাকিয়াও চাঁদের মত বড় দেখায়। কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সূর্য্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না। ভাবিয়া দেখ ইউরেনস্ কত দূরের বস্তু। এত দূরের গ্রহ-সম্বন্ধে আমরা অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নয়? দিন দিন নূতন যন্ত্র নির্ম্মিত

হইতেছে। হয় ত আরো দশ কি বিশ বৎসর পরে তোমরা ইউরেনসের আরো অনেক নূতন খবর পাইবে।

এত দূরে থাকা সত্ত্বেও আমরা ইউরেনসের চারিটি চাঁদের অর্থাৎ উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেটি বড় তাহা আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। মনে করিয়া দেখ, এত দূরের এত ছোট বস্তুর খবর জানা কত কঠিন। এই জন্যই আমরা চাঁদ কয়েকটির খবর বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। ইহাদের দুটিকে হার্সেল্ সাহেবই আবিষ্কার করিয়াছিলেন; বাকি দুইটির বিষয় আমরা হার্সেলের মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দূরবীণ ব্যবহার না করিলে শেষের চাঁদ দুটিকে দেখা যায় না।

ইউরেনস্‌কে খালি চোখে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়,—হঠাৎ দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয়। এইজন্য কেহ না দেখাইয়া দিলে, তোমরা কখনই নিজে নিজে ইউরেনস্‌কে দেখিতে পাইবে না। যদি জ্যোতিষ-জানা কোনো লোককে পাও, তাহা হইলে ইউরেনস্ আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, তাঁর কাছে জানিয়ো লইয়ো। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সম্বন্ধে ইংরাজি পাঁজি (Nautical Almanac) দেখিয়া ইউরেনসের সন্ধান তোমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিবেন।

নেপ্‌চুন্

ইউরেনসের পরেই নেপ্‌চুন্ গ্রহ। ইহার পরে আর কোনো গ্রহ আছে কি না, আমাদের জানা নাই। কাজেই নেপ্‌চুন সূর্য্য-জগতের সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন প্রহরীর মত সূর্য্যের রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে।

"নেপ্‌চুন্" এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার কথা জানিতেন না। জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে ইহার একটা সংস্কৃত নাম লেখা থাকিত। নেপ্‌চুন্‌কে পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপের জ্যোতিষীরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাজেই আমাদের হাজার দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার পুঁথিতে কেমন করিয়া ইহারনাম থাকিবে? যে-সব জ্যোতিষী পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, তাঁহারাও নেপ্‌চুনের কথা জানিতেন না।

ইউরেনস্ আবিষ্কারের যেমন একটি গল্প শুনিয়াছ, নেপ্‌চুনের আবিষ্কারের সেই-রকম আশ্চর্য্যজনক গল্প আছে। তোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে অবশ্যই "আকাশবাণী" বা "ভবিষ্যদ্বাণীর" বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশবাণী হইল—"মহারাজ, যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে।" রাজা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এ সব ভবিষ্যদ্বাণী নাকি দেবতারা

করিতেন, কিম্বা খুব গুণী লোকেরা গণনা করিয়া বলিতেন। নেপ্চুন্ গ্রহটিকে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাই খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। আকাশের কোন্ কোণে সে লুকাইয়া আছে তাহা অবশ্য দেবতারা জ্যোতিষীদিগকে বলিয়া দেন নাই, গুণী লোকে গুণিয়া বলিয়া দিয়াছিল। নেপ্চুন আবিষ্কারের গল্পটা বড় মজার।

জ্যোতিষীদের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত! কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের কোন্ জায়গায় দেখা যাইবে, তাঁহারা অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিষীরা গ্রহণের দিনক্ষণ পাঁজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তাঁহারা যে হিসাব করেন, গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। হার্সেল সাহেব ইউরেনস্ আবিষ্কার করিলে, উহা কোন পথে ঘুরিতেছে এবং কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় দেখা যাইবে, জ্যোতিষীরা এই-সব হিসাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বুঝা গেল, হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব-অনুসারে যেখানে দেখিবার কথা, জ্যোতিষীরা ইউরেনস্কে সেখানে দেখিতে পাইলেন না।

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র মিথ্যা হইবার নহে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক কষিতে ভুল হইয়াছে। চার পাঁচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিসাব করিতে

বসিয়া গেলেন, কিন্তু ভুল বাহির হইল না। জ্যোতিষীদের মাথায় মাথায় ভাবনা চাপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, ইউরেনস্ কেন ঠিক্ সময়ে দেখা দেয় না।

জ্যোতিষীরা বৎসরের পর বৎসর ভাবনা চিন্তায় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ইউরেনস্ যেন নিজের খেয়াল মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের আডামস্ নামে একটি যুবক এবং ফ্রান্সে লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহারা দুজনেই খুব ভাল অঙ্ক জানিতেন এবং তাঁহাদের কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইঁহাদের দুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা ছিল। কিন্তু তাহা নয়। দুজনের মধ্যে কোনো কালে দেখা শুনা ছিল না এবং কেহ কাহারো নামটি পর্য্যন্ত জানিতেন না। তখন পৃথিবীর সব জ্যোতিষীই ইউরেনসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই ইঁহারা দুজনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অঙ্ক কষিতে লাগিয়া গেলেন। ইঁহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চুম্বক লোহাকে টানিয়া রাখে, কোনো একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনস্‌কে টানিয়া রাখিতেছে, তাই সে ঠিক সময়ে আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে না। সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক করা এই দুই যুবকেয় কাজ হইল।

ভাবিয়া দেখ এই রকম হিসাব কত শক্ত। কিন্তু আডাম্‌স্ বা লিভেরিয়ার কেহই পিছাইলেন না, খুব পরিশ্রম করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন।

দুজনের হিসাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক করা হইল যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। যে অজানা গ্রহটি ইউরেনস্‌কে টানিতেছে, তাহা কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, সব কথাই তাঁহারা কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখিলেন। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, দুজনে পরামর্শ করিয়া অঙ্ক করিয়া একই রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তখনো পর্য্যন্ত তাঁহাদের দুজনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই।

আডাম্‌স্ সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল। শেষ হইবামাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ অনেক, তাই তিনি যুবক আডাম্‌সের হিসাব-পত্র হাতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে হিসাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তাঁহার কাগজ-পত্র জর্ম্মানির একজন বড় জ্যোতিষী গল্ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্য লোক নয়।

অজানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা যাইবে, তাহা লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল; গল্

সাহেব ইংরাজি ১৮৪৬ সালের ২৩সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার বড় দূরবীণ দিয়া গ্রহটির খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; একটু খোঁজ করার পরেই সেই অজানা গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল। আকাশের দিকে না তাকাইয়া কেবল অঙ্ক কষিয়া লিভোরিয়ার যাহার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্‌ সাহেব এই রকমে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মত সত্য হইয়া গেল। সেই নূতন গ্রহটিই এখন আমাদের কাছে নেপ্‌চুন নামে পরিচিত হইতেছে।

নেপ্‌চুন-আবিষ্কারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িলে, জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিষ্কারের খবর জানিবামাত্র তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, যুবক আডাম্‌সের একটা হিসাব তাঁহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব অনুসারে তাড়াতাড়ি দূরবীণ দিয়া নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপ্‌চুনকে দেখিতে পাইলেন। রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডাম্‌স্‌ সাহেবের হিসাব হাতে পড়িবামাত্র যদি তিনি নূতন গ্রহের সন্ধান করিতেন তাহা হইলে নেপ্‌চুন-আবিষ্কারের সম্মান ফরাসী লিভেরিয়ারের ভাগ্যে না পড়িয়া, ইংরাজ আডাম্‌সের ভাগ্যেই পড়িত এবং ইহাতে ইংলণ্ডেরই গৌরব বৃদ্ধি হইত।

যাহা হউক, শত শত বৎসর গ্রহনক্ষত্রদের হিসাব করিয়া যাহা কখনো দেখা যায় নাই, নেপ্‌চুনের আবিষ্কারে তাহাই দেখা গিয়াছিল। এই জন্য ঘটনাটি জ্যোতিষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নেপ্‌চুনের আবিষ্কার হইলে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও চলাফেরা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশ-বিদেশের জ্যোতীষীরা রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণ দিয়া নেপ্‌চুনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া অল্প দিনের মধ্যে উহার সকল খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নেপ্‌চুন সূর্য্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে, এজন্য সূর্য্য হইতে ইহা অনেক দূরে আছে। আমাদের কাছ হইতে সূর্য্য যত দূরে আছে, নেপ্‌চুন তাহারি ত্রিশ গুণ দূরে রহিয়াছে। সেখানে যদি জীবজন্তু বা মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সূর্য্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপ্‌চুন কত দূরে আছে। এত দূরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং ছোট দূরবীণেও দেখা যায় না।

আকারে কিন্তু ইহা খুব ছোট নয়,—প্রায় পঁচিশটি পৃথিবীর সমান। কিন্তু আগাগোড়াই সম্ভবত হালকা বাষ্প দিয়া গড়া। তাই দেহটা এত বড় হইলেও, তাহার ওজন বেশি নয়। ওজনে উহা মোটে সতেরোটা পৃথিবীর সমান অর্থাৎ ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি।

নেপ্চুন কত সময়ে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। সে যে-পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে তাহা সকলের চেয়ে বড়, তার উপরে প্রতি সেকেণ্ডে সে সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই সব কারণে একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় এক শত পঁয়ষট্টি বৎসর সময় লাগে।

তাহা হইলে দেখ, নেপ্চুনের এক-একটা বৎসর আমাদের এক শত পঁয়ষট্টি বৎসরের সমান। কি ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যদি নেপ্চুনে গিয়া বাস করিতাম, তাহা হইলে নেপ্চুনের এক বৎসর বয়স হইবার অনেক আগে আমরা বুড়া হইয়া যাইতাম।

নেপ্চুন মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক্ খায়, তাহা জ্যোতিষীরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। কাজেই কত সময়ে তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। নেপ্চুন্ ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই ইহা ঠিক করা যায় নাই; হয় ত কিছুদিন পরে জ্যোতিষীরা ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন।

দিনরাত্রির কথা বলিলাম,—তাই শুনিয়া মনে করিয়ো না, সেখানে পৃথিবীরই মত দিনের আলো দেখা যায়। আগেই বলিয়াছি নেপ্চুন হইতে সূর্য্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত দেখা যায়, কাজেই দিনের আলো সেখানে বেশি হইতে পারে না। কিন্তু সে আলো জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি।

নক্ষত্রেরা কোটি কোটি মাইল দূর হইতে আলো দেয় কিন্তু সূর্য্য ঐ সব নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক কাছে থাকিয়া আলো দেয়। এজন্য সূর্য্যকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না।

নেপ্‌চুন্ পৃথিবী হইতে কতদূরে লুকাইয়া আছে ভাবিয়া দেখ, কিন্তু তথাপি জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া তাহার একটি চাঁদকে ধরিয়াছেন এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপ্‌চুনের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাও ঠিক করিয়াছেন। এই চাঁদটিও ইউরেনসের চাঁদের মত উল্টা পাকে নেপ্‌চুন্‌কে প্রদক্ষিণ করে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ছয় দিন সময় লয়। তাহা হইলে দেখ, নেপ্‌চুনের চাঁদ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দেখায়। আমাদের চাঁদটির পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় প্রায় একমাস সময় কাটিয়া যায়।

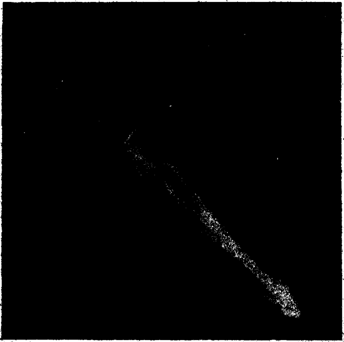
নেপ্‌চুনের চাঁদ কেন উল্টা পাকে ঘুরে, তাহা আজও ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজানা ব্যাপার এখনো অনেক আছে, তোমরা যখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, তখন হয় ত এখনকার অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে।

ধূমকেতু

এ-পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের কথা এবং সূর্য্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম। ভাবিয়া দেখ, সূর্য্যের রাজ্যটি কত বড় এবং কেমন সুন্দর! বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া নেপ্‌চুন পর্য্যন্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। ঠিক্ সময়ে ঠিক্ পথে তাহারা সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে,—তাহাদের চলাফেরাতে একটুও অনিয়ম নাই। গ্রহদের চাঁদগুলিও তেমনি। ইহারাও ঠিক্ সময়ে ঠিক পথে গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনই পথ ভুল করে না, বা এক সেকেণ্ডের জন্য আগু-পিছু হয় না। খুব ভাল ঘড়িও স্লো ফাষ্ট্ যায় কিন্তু ইহাদের স্লোফাষ্ট্ নাই। এমন শাসন, এমন কড়া নিয়ম-কানুন তোমরা আর কোনো জায়গায় দেখিয়াছ কি? তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্তু কোনো রাজাকে সূর্য্যের মত অনায়াসে এবং নিরাপদে রাজ্য চলাইতে দেখিয়াছ কি? আমরা দশ পাঁচ জন লোক একত্র হইলে কত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহেরা এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও কেহ কাহাকে ধাক্কা দেয় না। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা?

এমন সুন্দর এমন সুশাসিত সূর্য্যের রাজ্যেও কিন্তু কখনো কখনো এক-একটা বিভীষিকা দেখা দেয়। বিভীষিকাটা কি, তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ,—ধূমকেতু। তোমরা নিশ্চয়ই ধূমকেতু দেখিয়াছ। কয়েক বৎসর আগে (ইংরাজি

১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে) পূর্ব্ব দিকের আকাশে একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতু উঠিয়াছিল। এই রকম একটা আকাশজোড়া প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় না কি? এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম, ধূমকেতুরা সূর্য্যের রাজ্যের বিভীষিকা। ভয় দেখাইলেও কিন্তু ইহারা কাহারো অনিষ্ট করে না এবং অনিষ্ট করিবার শক্তিও ইহাদের নাই। ধূমকেতুদের অত বড় বড় লেজগুলি এমন হাল্কা বাষ্প দিয়া প্রস্তুত যে, তাহাদের লেজের ভিতর দিয়া পিছনের ছোট তারাগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়।



১৯০৮ সালের ধূমকেতুর প্রথম অবস্থা

এখানে একটি ধূমকেতুর ছবি দিলাম। ইংরাজি ১৯০৮ সালের ভোর রাতে পূবের আকাশে ইহাকে কিছুদিন দেখা

গিয়াছিল। দেখ, ইহার লেজের ভিতর দিয়া পিছনের তারাগুলিকে দেখা যাইতেছে। ইহা হইতেই তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, লেজ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজন্যই জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওজন আধ সের বা তিন পোয়ার বেশি হয় না,—অর্থাৎ যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে তোমরা একটা বড় ধূমকেতুর লেজ অনায়াসে গুটাইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার।

যাহার লেজ এত হাল্‌কা তার মুণ্ডটা নিশ্চয়ই খুব ভারি হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ? কিন্তু ধূমকেতুর মুণ্ডও খুব ভারি নয়,—তবে লেজের চেয়ে মুণ্ড ভারি।

ছেলে-বেলায় আমরা যখন ভূতের গল্প শুনিতাম, তখন আমার বড় ভয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যখন বলিতেন, ভূত কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া; তাহারা কাহারো অনিষ্ট করে না, এমন কি ভূতে ঢিল মারিলে তাহা কাহারো গায়ে লাগে না;—তখন মনে মনে একটু সাহস হইত। ধূমকেতুগুলো যেন সূর্য্যের রাজ্যের ভূত,—কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখা দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু যখন জ্যোতিষীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার জিনিস কিছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাঁকি, তখন সাহস হয়।

কিন্তু কিছুদিন আগেও জ্যোতিষীরা এরকমে সাহস দিতে পারিতেন না ; কারণ তখন তাঁহারা ধূমকেতুর ভিতরের খবর জানিতেন না। এজন্য আগেকার লোকে ধূমকেতু দেখিলেই ভয় পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে অজন্মা হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। যাঁহারা জ্যোতিষের খবর জানেন না, তাঁহারা আজও ঐ রকম বৃথা ভয় করেন।

ধূমকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদিগকে বলিব। বুঝিতেই পারিতেছ ইহারা সূর্য্যের রাজ্যের প্রজা নয়। ধূমকেতু যদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা শনির মত জিনিস হইত, তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিষীরা ইহাদের কথা পুরানো পুঁথিপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে ধূমকেতুর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখা নাই।

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি যে কি, তাহা তোমাদিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই এক-একটা সূর্য্যের মত বড় জিনিস ; হয় ত তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, একা সূর্য্যই এই আকাশে রাজত্ব করে না। সূর্য্যে সূর্য্যে আকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের সূর্য্য এই অসংখ্য সূর্য্যের মত একটি। এখন ভাবিয়া দেখ, সূর্য্য তাহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া যে জায়গাটুকুতে রহিয়াছে তাহা অনন্ত আকাশের তুলনায় কত ছোট! পৃথিবীর উপরে যদি

কেহ একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে লইয়া ঘরকন্না পাতায়, তাহা হইলে ইহা যেমন একটা ছোট ব্যাপার হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া সূর্য্য যে ঘরকন্নাটি পাতাইয়াছে, অনন্ত আকাশের কাছে এবং অসংখ্য নক্ষত্রদের কাছে তাহা ঐ রকমই একটা ছোট ব্যাপার।

খুব নির্জ্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একখানি ছোট ঘর বাঁধিয়া বাস করি, তাহা হইলে কখনো কখনো দুই এক-জন অতিথি বা রবাহূত অনাহূত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমরা কি করি? তাহাদের স্নানের ও আহারের জোগাড় করিয়া দিই। হয় ত এক বেলা, না হয় এক দিন দুদিন থাকিয়া অতিথি যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যায়। আমাদের সূর্য্যদেবটি এই অনন্ত আকাশের এক কোণায় যে একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া আটটি গ্রহকে লইয়া বাস করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে দুই একটি অতিথি বা পথিক আসিয়া দেখা দেয়।

সূর্য্যের বাড়ীর অতিথি কাহাকে বলিতেছি তোমরা বোধ হয় এখনো বুঝিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের চেয়ে অনেক ছোট যে-সব জড়পিণ্ড সূর্য্যের রাজ্যের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহাদিগকেই অতিথি বলিতেছি। অতিথি বা পথিকের খবর যেমন আমরা জানি না, ইহাদেরও খবর আমরা জানি না। ইহারা সূর্য্যের জগতের জিনিস নয়। নেপ্‌চুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত অকাশের যেখানে-

সেখানে নিজেদের খেয়াল মত ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আকারে বড় নয়, তার উপরে সূর্য্য বা নক্ষত্রদের মত আলোও তাদের নাই, এজন্য দূরবীণ দিয়া তাহাদের খোঁজ করা যায় না। যখন পথিকের বেশে অতিথি হইয়া সূর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করে, আমরা তখনি ইহাদিগকে সূর্য্যের আলোতে দেখিতে দেখিতে পাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল জড়পিণ্ডেরাই আমাদের কাছে, ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয়।

বুঝিতে পারিলে কি? তাহা হইলে দেখ,—আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের সহিত সূর্য্যের যেমন আত্মীয়তা আছে, ধূমকেতুদের সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সূর্য্য-জগতের অতিথিমাত্র। কোনো অজানা দেশ হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল কয়েক-দিনের জন্য এই জগতে আসে। কিন্তু সূর্য্য ছাড়িবার পাত্র নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত হইতে সহজে মুক্তি পায় না। অতিথি ধূমকেতুরাও মুক্তি পায় না। সূর্য্য-জগতে পা ফেলিবা মাত্র সূর্য্য তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে। কাজেই তাহারা ছুটিয়া সূর্য্যের দিকে চলে এবং শীঘ্র শীঘ্র একবার মাত্র সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া এই রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে।

আমরা যত ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই এই রকমের অতিথি-জ্যোতিষ্ক। ইহারা আমাদিগকে খবর দিয়া আসে না,—কিন্তু আসিলেই সূর্য্য জানিতে পারে এবং

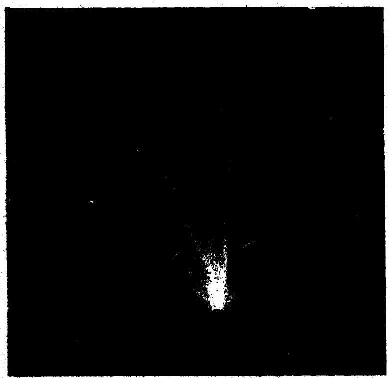
তাহাদিগকে টানিয়া নিজের চারিদিকে একবার কলুর বলদের মত ঘুরপাক্ খাওয়ায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এরকমে লাঞ্ছনা দেওয়া সূর্য্যের ভারি অন্যায়; কিন্তু এই ঘটনা বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই ঘটে। জ্যোতিষীরা ইহার সাক্ষী। তাঁহারা প্রতি বৎসরেই অন্তত আটটি দশটি নূতন অতিথিকে সূর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই সূর্য্য এই রকমে কষ্ট দিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, তাই খালি চোখে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া ইহাদের লাঞ্ছনা দেখিতে পান। যদি বড় ধূমকেতু হঠাৎ আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল তখনি তাহাদিগকে খালি চোখে দেখিতে পাই।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাড়িতে কবে অতিথি আসিবেন, তাহা যেমন আমরা এক বৎসর ছমাস কি এক মাস আগেও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে ধূমকেতু উঠিবে তাহাও আমরা দুমাস ছমাস বা দশ দিন আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়। যত বড় বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই যাওয়া-আসা এই রকমেই হইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে (১৯০৮ সালে) শীতকালে যে একটি বড় ধূমকেতুকে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে দেখা গিয়াছিল, তাহার

কথা তোমাদের মনে আছে কি না জানি না। এটাও ঐ-রকম হঠাৎ আসিয়া দেখা দিয়াছিল আবার কয়েক দিনের মধ্যে সূর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে আসিল। তাহাকে আহার করানো গেল, দুই বেলা তিন বেলা খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল। এ-রকম ঘটনা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি।



১৯০৮ সালের বহুপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু

আমাদের বাড়িতেই একটি হিন্দুস্থানী পথিক ঐ রকমে

আসিয়াছিল। সে বাড়িতে ত্বদিন থাকিয়া আমার ছোট ছোট ভাইদের খুব যত্ন করিতে লাগিল। বাবা ও মা বলিলেন, কোদো তা'হলে বাড়িতেই থাক। লোকটার নাম ছিল কোদো। সে ঐদিন অবধি আমাদের বাড়িতে আছে; এখন সে যেন আমাদের বাড়িরই লোক। দেখ,—অতিথপথিক লোক এক বেলার জন্য বাড়িতে আসিয়া কি রকমে ঘরের লোক হইয়া গেল।

যে-সব ছোট বড় ধূমকেতু প্রতি বৎসরে দু'দশ দিনের জন্য সূর্য্যের রাজ্যে অতিথি হয়, তাদের মধ্যেও দু'চারটিকে ঐ রকমে সূর্য্যের পরিবারের লোক হইতে দেখা যায়। তখন তাহারা কি করে জান কি? পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সূর্য্যকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য তাহার পরিবারের সকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক্ খাওয়ায়; যে-সব ধূমকেতু পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগকেও সে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুরাইয়া আনিতে থাকে।

এখানেও দেখ সূর্য্যের কত অন্যায়। অজানা রাজ্য হইতে আসিয়া যাহারা এই জগতে পা দিয়াছে, তাহাদিগকে এই রকমে বন্দী করা কি সূর্য্যের উচিত? কেবল বন্দী করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সূর্য্য সেগুলিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ধূমকেতুরা যদি ইচ্ছা করিয়া সূর্য্যের রাজ্যের প্রজা হইত, তাহা হইলে দোষ ছিল না, কিন্তু সূর্য্য এবং বৃহস্পতি শনি

ইউরেনস্ প্রভৃতি বড় বড় গ্রহেরা জোর করিয়া ধূমকেতুদিগকে আটক করে এবং ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইহা কি কম অত্যাচারের কথা।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—সে আবার কি! সূর্য্য শনি বৃহস্পতি ধুমকেতুদিগকে আটক করে কি করিয়া? কিন্তু ইহারা সত্যই আটক করে। জ্যোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা ঐ রকমে বন্দী ধূমকেতুর অন্তত কুড়ি পাঁচশটার নাম বলিয়া দিবেন।

সূর্য্যের নিজের গায়ে কি রকম জোর তাহা তোমরা আগে শুনিয়াছ। দুই শত আশী কোটি মাইল তফাতে আকাশের এক কোণে যে নেপ্চুন গ্রহটি লুকাইয়া আছে, সূর্য্য তাহাকেও টানিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কাজেই সে-সব ধূমকেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেয়, কায়দায় পাইলে সূর্য্য তাহাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া ফেলে। বিড়াল ভয় পাইলে ও রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেখিয়াছ ত! ধুমকেতুগুলিও সূর্য্যের কাছে গেলে সেই রকমে লেজ ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিন্তু সূর্য্য তাহাতে ভয় পায় না,—সুবিধা পাইলেই উহাদের কোনোকোনোটিকে ধরিয়া নিজের চারিদিকে চিরদিনের জন্য ঘুরপাক্ খাওয়াইতে থাকে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—সূর্য্যের হাত হইতে যাহারা রক্ষা পায়, তাহাদের বুঝি ফাঁড়া কাটে। কিন্তু তাহা হয় না। ফিরিবার পথে বা প্রবেশের পথে বৃহস্পতি শনি

ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের মত বড় বড় গ্রহদের সঙ্গে যদি ধূমকেতুর দেখা হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! ইহারা ধূমকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ানক টানা-হেঁচড়া করে এবং তাহাদের বেগ কমাইয়া দেয়। ইহাতে দুই একটা ধূমকেতু এমন জখম হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর সূর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই তখন তাহাদিগকে গ্রহদেরি মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতে হয়। এই-রকম টানাটানি ধস্তাধস্তিতে দুই-একটা ধূমকেতু ভাঙিয়া চূরিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে দু-একটা গল্প তোমাদিগকে পরে বলিব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ধূমকেতুদের মধ্যে পলাতক ও বন্দী এই দুই রকম ভাগ আছে। পলাতকদের সংখ্যাই বেশি। ইহারা সূর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এক-বার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের জন্য এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যদি আকারে বড় হয় তবেই আমরা পৃথিবী হইতে উহাদিগকে একবার মাত্র দেখিতে পাই। তাহার পরে যে ইহারা কোথায় যায়, তাহা ঠিক করিতে পারি না।

বন্দী ধূমকেতুরা সূর্য্যজগতে প্রবেশ করিয়া, সূর্য্য বা বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বাঁধা পড়িয়া যায় যে, তাহাদের আর পলাইবার শক্তি থাকে না। কাজেই তাহারা গ্রহদের মত এক-একটা নির্দ্দিষ্ট পথে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে পাক

দিতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তাহারা যখনি পৃথিবীর কাছ দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখনি আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই! ইহারা বার বার আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ ধরিয়া কতদিনে ইহাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণ হয়, জ্যোতিষীরা তাহার সকলি জানেন। কাজেই কোন্ বৎসরের কোন্ তারিখে পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে দেখা যাইবে, ইহাও হিসাব করিয়া বলা চলে! কিন্তু পলাতক ধূমকেতুদের সম্বন্ধে এ-রকম একটি কথাও বলা চলে না।

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধূমকেতুকে ধরিয়া বন্দী করিয়াছে, জ্যোতিষীরা তাহার একটা হিসাব করিয়াছেন। গ্রহদের মত বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়,—তেরো শত পৃথিবী জোড়া না দিলে একটা বৃহস্পতিকে গড়া যায় না। সে একাই প্রায় ষোলটি ধূমকেতুকে বন্দী করিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিই সাত আট বৎসরে সূর্য্যকে এক একবার ঘুরিয়া আসে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছাড়াইয়া বেশি যাইতে পারে না। শনি, ইউরেনস্ ও নেপ্চুন বৃহস্পতির চেয়ে ছোট বটে কিন্তু ধূমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। এজন্য ইহারাও কতকগুলি ধূমকেতুকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রকারে শনি দুইটিকে বন্দী করিয়াছে এবং ইউরেনস্ তিনটিকে ও নেপ্চুন দুইটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

হ্যালির ধূমকেতু

ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে পূবে ও পশ্চিমে যে খুব বড় ধূমকেতুটিকে তোমরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিলে, তাহার নাম হ্যালির ধূমকেতু। হ্যালি সাহেব একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম অনুসারে ধূমকেতুটির নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপ্‌চুন গ্রহই সূর্য্য-জগতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই সে নেপ্‌চুনের কাছ হইতে সূর্য্যের কাছ পর্য্যন্ত একটা লম্বা রাস্তা দিয়া পঁচাত্তর বৎসর অন্তর সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে এবং এক একবার আমাদিগকে দেখা দেয়।

হ্যালির ধূমকেতুর কথা বলিতে গিয়া হ্যালি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহার গল্পটা বলি শুন,—বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত সত্তর বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আজও তাঁহার কথা কেহ ভুলিতে পারে নাই।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, ধূমকেতুর চলাফেরা পরীক্ষা করা বৃথা। ইহাদের সকলেই ঝি, একবারমাত্র আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জন্য

সূর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। জ্যোতিষীদের এই কথাটি হ্যালি সাহেবের মনের মত হয় নাই। তিনি খুব অঙ্ক জানিতেন,—পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কোন্ সালের কোন্ তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল, তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক কষিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া তাঁহার মনে ঠিক্ বিশ্বাস হইল, সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা দেয় এ-রকম ধূমকেতুও অনেক আছে। কিন্তু এ-রকম একটা নূতন কথা ফস্ করিয়া বলা ঠিক্ নয়,—তাই কোন্ কোন্ ধূমকেতু বার বার পৃথিবীকে দেখা দিয়াছে, হ্যালি সাহেব তাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন।

ইংরাজি ১৬৮২ সালে হ্যালি সাহেব জীবিত ছিলেন। ঐ বৎসরে একটা বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। হ্যালি সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন ১৫৩১ এবং ১৬০৬ সালে ঠিক্ ঐ রকমের বড় ধূমকেতুকে পৃথিবী হইতে দেখা গিয়াছিল। যে পথ ধরিয়া ঐ দুইটি ধূমকেতু সূর্য্যকে ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুর পথেরও মিল ধরা পড়িল। এখন হ্যালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের কথাটি বলিবার সুবিধা পাইয়া গেলেন। তিনি অন্যান্য জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন,—১৬৮২ সালের ধূমকেতুটি নূতন জিনিস নয়। ইহাই ১৫৩১ সালে এবং ১৬০৭ সালে

আমাদিগকে এক-একবার দেখা দিয়াছে। ইহা পঁচাত্তর বৎসর অন্তর এক একবার সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, অতএব ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে তাহাকে আবার দেখা যাইবে।

এমন ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীরা আগে কখনই শুনেন নাই। হ্যালির কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। ১৭৫৭ সালে ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হ্যালি সাহেবের আর প্রতীক্ষা করা হইল না। নিজের গণনা সত্য হইল কিনা তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যে-সময়ে ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহার দশ বৎসর আগে ছিয়াশী বৎসর বয়সে হ্যালি সাহেবের মৃত্যু হইল।

ক্রমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জন্য চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখ, সে সময়ে জ্যোতিষীদের মনে কত উদ্বেগ, কত উৎসাহ। তাঁহারা দূরবীণ খাটাইয়া কাগজ পেন্‌সিল্ লইয়া হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ফরাসীদের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। ইঁহার নাম ক্লারট্ (Clairut); ইনি হিসাব করিয়া বলিলেন, হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে বৃহস্পতির দেখা শুনা হইবে। বৃহস্পতির টানে হয় ত ধূমকেতু কিছুকাল পরে দেখা দিবে।

যাহা হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাল উপস্থিত হইল।

নানা দেশের জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া ধূমকেতুর খোঁজ আরম্ভ করিলেন। দুই তিন মাস খোঁজ করার পরও কিন্তু ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জ্যোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি হ্যালির কথা মিথ্যা। তবুও তাঁহারা খোঁজ করা ছাড়িলেন না। কিন্তু আর বেশি দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল না, সেই বৎসরের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ধূমকেতুর ছোট দেহ দূরবীণে ধরা পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। এই রকমে হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী কথায় কথায় সত্য হইয়া গেল।

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিষীদের সেদিন কি আনন্দ। হ্যালি সাহেব যদি সেদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার কি আনন্দ হইত তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা হউক, ঐ দিন হইতেই জ্যোতিষীরা বুঝিয়াছিলেন, সকল ধূমকেতু একবার দেখা দিয়া পলাইয়া যায় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে গ্রহদের মত সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধূমকেতুও অনেক আছে।

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়াত্তর বৎসর কাটিয়া গেলে হ্যালির ধূমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা গিয়াছিল। তার পরে ১৯১০ সালে সেই ধূমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে ইংরাজি ১৯৮৫ সালে সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমরা বাঁচিয়া থাকিব না, কিন্তু তোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, ১৯১০ সালে বৈশাখ



১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে হ্যালির ধূমকেতু

মাসে তোমরা যে ধূমকেতুকে দেখিয়াছিলে, সেটি অতি পুরাতন জিনিস। ইহাকে দেখিয়াই হ্যালি সাহেব দুই শত

বৎসর পূর্ব্বে ধূমকেতুদের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিতে পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, জ্যোতিষীরা পুরাতন ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে যখন দিগ্‌বিজয়ী রাজা উইলিয়ম্ ইংলণ্ড আক্রমণ করেন তখনো এই ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল; এবং খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনবাসীরাও ইহার উদয় দেখিয়া একবার ভয় পাইয়াছিল।

ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি

হ্যালির ধূমকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। এখন ধূমকেতুদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব।

আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুদের নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট জড়কণা দিয়া তাহাদের দেহ প্রস্তুত, সুতরাং তাহাদের স্থায়ী আকার কেমন করিয়া থাকিবে? এক গাদা বালির আকৃতি কি রকম তোমরা বলিতে পার কি? কখনই পার না। বালিগুলিকে যখন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া হয়, তখন আকৃতি ঝুড়ির মত হয়; বাল্‌তিতে বোঝাই দিলে বাল্‌তির মত হয়। ধূমকেতুদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে একই ধূমকেতুর নানা আকৃতি হয়। সূর্য্য হইতে যখন দূরে থাকে তখন তাহাদের লেজ থাকে না; সূর্য্যের কাছে আসিতে আরম্ভ করিলে একটু একটু করিয়া লেজ বাহির হইতে থাকে। তার পরে সূর্য্যের খুব কাছে আসিলে, লেজও খুব লম্বা হয়। শেষে তাহারা যখন সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন লেজগুলি আপনা হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে গেলে লেজের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একই ধূমকেতুর ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবী বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহদের

যেমন এক-একটি নির্দ্দিষ্ট আকৃতি আছে, ধূমকেতুদের তাহা নাই। সকলেরই এক-একটা মুণ্ড থাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ মুণ্ড হইতে লেজ গজাইয়া উঠে,—ইহাই তাহাদের আকৃতি।

ধূমকেতুদের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কখনই সূর্য্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; সূর্য্য যেদিকে থাকে, ধূমকেতুদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার বেশি লেজ থাকে না, কিন্তু এক-একটা ধূমকেতুর লেজ প্রায়ই দুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি লম্বাও মন্দ নয়। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া একটা ধূমকেতুর লেজকে প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু লম্বা হইলে কি হয়,—উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। আমরা আগেই বলিয়াছি, গোটা লেজকে গুটাইয়া দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিলে, তাহা আধ সের তিন পোয়ার বেশি ভারি হয় না।

ধূমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি গল্প বলি, শুন।

ইংরাজি ১৭৭০ সালে একটি বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। লেক্‌সেল্ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার আবিষ্কার করেন, এজন্য লোকে ইহাকে লেক্‌সেলের ধূমকেতু বলিত। ঘুরিতে ঘুরিতে সে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে

আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড লেজ দেখিয়া জ্যোতিষীরা ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, যদি ধূমকেতুর লেজটা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগে বা তাহার মুণ্ডটা ধাক্কা দেয় তাহা হইলে বুঝি পৃথিবী চুরমার হইয়া যাইবে। লেক্‌সেল্ চেষ্টার ত্রুটি করিল না, এক দিন সত্যই তাহার লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, এবার বুঝি সর্ব্বনাশ হইল! কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই লেক্‌সেলের ধূমকেতুকে পরে বৃহস্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে হইয়াছিল। বৃহস্পতির চারিটি বড় চাঁদ উহার লম্বা লেজটিকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহার লেজ ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া গিয়াছিল। এই রকমে পৃথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার পরে, লেক্‌সেল্ আর সূর্য্যজগতে পা দেয় নাই।

তাহা হইলে দেখ, যতই লম্বা হউক্ না কেন, ধূমকেতুর লেজ বাতাসের চেয়েও হাল্কা। গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহদের একটুও ক্ষতি হয় না,—বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। জ্যোতিষীরা বলেন, সে-বার যখন হ্যালির ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান্ হয় নাই। ধূমকেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাস করিয়াছিলাম, একথাটি পর্য্যন্ত আমরা তখন জানিতে পারি নাই।

ধূমকেতুর মুণ্ড লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিন্তু তাহাতেও সার বা জমাট জিনিস নাই। ধূমকেতুর আর একটা গল্প বলিলে, ইহা তোমরা বুঝিতে পারিবে।

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ সালের অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আকাশে একটি বেশ বড় ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল। বায়েলা নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বৎসর নয় মাসে এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জানা গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার দেখা দিবে।

ফুট্‌বল ক্রিকেটের ম্যাচ্‌ দেখা তোমাদের যেমন একটা বাতিক, আকাশের কোথায় কি হইতেছে খোঁজ করা জ্যোতিষীদের সেই রকম বাতিক। রাত্রিতে আকাশখানিকে পরিষ্কার পাইলে, তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; তখন দূরবীণে চোখ লাগাইয়া কোথায় কি আছে, দেখিতেই তাঁহাদের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। ১৮৩২ সালে যে দিন বায়েলার ধূমকেতুর আসার কথা ছিল, তাহার দশ দিন আগে হইতে জ্যোতিষীরা উহার খোঁজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক্‌ সময়ে ধূমকেতু দেখা দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহাকে যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে রকম দেখা গেল না।

বুঝা গেল। ধুমকেতুটি যেন এক গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, বৃহস্পতি বুঝি তাহার লেজটি ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আসিবার কথা ছিল। সে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সে-বার জ্যোতিষীরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পান নাই। কাজেই ১৮৪৬ সালে সে যখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সময় আসিল, জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া বায়েলাকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মূর্ত্তি দেখা গেল, তাহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বায়েলার সেই লম্বা লেজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার সেই সুগোল মূর্ত্তি মিলিল না,—সে একটা মুগুরের মত একটা অদ্ভুত আকৃতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার পরে সে যতই সূর্য্যের কাছাকাছি হইতে লাগিল, তাহার মাঝখান্‌টা সরু হইয়া ঠিক ডম্‌বেলের মত হইয়া পড়িল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধূমকেতু সুস্পষ্ট দু'টা ধূমকেতু হইয়া দাঁড়াইল।

এই ঘটনায় জ্যোতিষীরা যে কত বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু সেই যমক ধূমকেতুকে সে বৎসর আর ভাল করিয়া দেখিবার

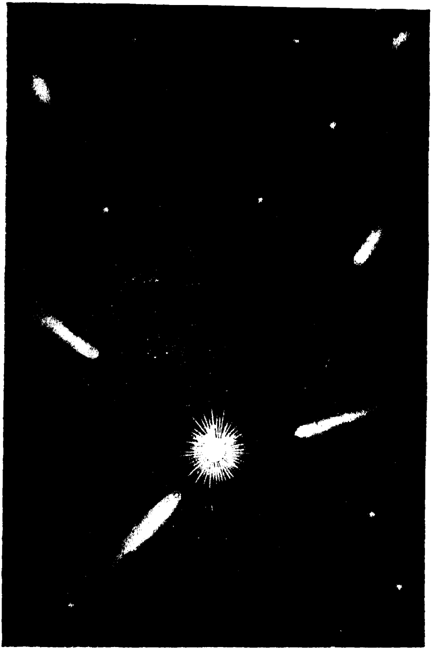
সুবিধা হইল না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, ১৮৫২ সালে তাহারা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই ছয়টা বৎসর তাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৮৫২ সালে তাহারা ঠিক সময়েই উদিত হইল, কিন্তু এবারে তাহাদের যমক মূর্ত্তি দেখা গেল না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন,—বায়েলার দুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল তফাৎ হইয়াছে। ইহার পরে ১৮৫৭ সালে তাহাদের ফিরিবার কথা ছিল। বায়েলার আরো কি দুর্গতি হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার দেহের একটুক্‌রাকেও সে বৎসরে দেখা যায় নাই। সেই সময় হইতে বায়েলা একেবারে নিরুদ্দেশ।

বায়েলার ধূমকেতুর এই রকম দুর্গতি জ্যোতিষের একটা মজার গল্প। ধূমকেতুদের লেজে বা মুণ্ডতে যে কোন সার বস্তু নাই, এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় না কি? বায়েলার মুণ্ডতে যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস থাকিত তাহা হইলে সেটা কখনই সূর্য্য বা গ্রহদের টানে ঐ রকমে ভাঙিয়া চূরিয়া ধূলা হইয়া যাইত না।

ধূমকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম। কেন সূর্য্যের কাছে আসিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং দূরে গেলে লেজ ছোট হইয়া আসে, কেবল এই কথাটাই তোমাদিগকে বলা হয় নাই।

এখানে ধূমকেতুর একটা ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই



ধূমকেতুর লেজ বড় হওয়া

বুঝিবে ধূমকেতুর লেজটি সর্ব্বদাই সূর্য্যের উল্টা দিকে রহিয়াছে এবং সে যেমন সূর্য্যের কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে।

লেজের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুরা যখন সূর্য্য হইতে দূরে থাকে তখন তাহাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডগুলির মধ্যে কোনো রকম চঞ্চলতা থাকে না। কিন্তু সূর্য্যের কাছে আসিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয়। তাহারা তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরকে ধাক্কাধুক্কি মারিতে থাকে। কতকগুলি পরস্পরকে ঠোকাঠুকি দিতে থাকিলে কি হয়, তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। একখানা পাথরকে আর একখানা পাথরে টুকিতে থাক, দেখিবে দু'খানাই গরম হইয়া পড়িয়াছে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুল্কি বাহির হইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণে ধূমকেতুর দেহের পিণ্ডগুলি পরস্পরকে ঠোকাঠুকি করিয়া ঠিক্ ঐ দশাই পায়—খুব গরম হইয়া উঠে এবং শেষে দেহের কতক অংশ বাষ্প হইয়া পড়ে। জ্যোতিষীরা বলেন, এই বাষ্পই সম্ভবতঃ লেজের সৃষ্টি করে। তার পরে ধূমকেতুরা যখন সূর্য্যের কাছ হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তখন ঠোকাঠুকির পরিমাণ কমিয়া আসে, কাজেই আর নূতন বাষ্প জন্মিতে পারে না বলিয়া লেজটাও ছোট হইয়া পড়ে।

ধূমকেতুর হাল্কা লেজগুলি কেন সকল সময়ে সূর্য্যের উল্টা দিকে থাকে, তোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা যাহা বলেন, তোমরা বোধ হয় তাহা ভাল বুঝিবে না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখিয়া দাও যে, ধূমকেতুর দেহ হইতে যে বাষ্প বাহির হয় তাহা যখনি সূর্য্যের দিকে যাইতে চায়, সূর্য্য জোর করিয়া তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দেয়। কাজেই অন্য কোনো পথ না পাইয়া বাষ্পরাশি সূর্য্যের উল্টা দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। এই একপাশে-ছড়ানো বাষ্পকেই আমরা দূর হইতে ধূমকেতুর লেজের আকারে দেখিতে থাকি।

উল্কাপিণ্ড

মেঘ নাই, ধোঁয়া নাই, কুয়াসা নাই, এমন পরিষ্কার রাত্রিতে তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন হয় ত দেখিবে, ফস্ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। এই রকম ঘটনাকে আমরা উল্কাপাত বলি এবং যেগুলি ঐ রকমে ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উল্কাপিণ্ড বলি। লোকে ইহাকে "নক্ষত্র-খসা" বলে এবং নক্ষত্র-খসাকে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করে।

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে এক বুড়ী ঝি ছিল; নক্ষত্র-খসা দেখিলেই সে চোখ বুঁজিয়া দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাদের নাম করিত, আর পাঁচ রকম ফুলের নাম বলিত। তাহার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম করিলে নক্ষত্র-খসিয়া জগতের অমঙ্গল করিতে পারে না।

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই বলুক, আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কখনই মাটিতে পড়িতে পারে না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহা জান,—তাহাদের সকলেই এক একটা সূর্য্য, অনেকে আবার সূর্য্যের চেয়ে শত শত গুণ বড়। এই রকম একটা জিনিস যদি এই ছোট পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কি ভয়ানক কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেকেণ্ডে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় না কি?

জ্যোতিষীরা উল্কাপাত-সম্বন্ধে কি বলেন শুন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া সূর্য্যের রাজ্যে কতকগুলি খুব ছোট জড়পিণ্ডও আছে। এগুলি কত ছোট তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন না। কতকগুলি হয় ত ইটের মত কাঁকরের মত ছোট; আবার কতকগুলি হয় ত দশ মণ বিশ মণ পাথরের মত বড়। এগুলির নিজেদের আলো নাই, কিন্তু গ্রহদের মত গতি আছে। পৃথিবী যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট পথে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, এই ছোট পিণ্ডগুলির প্রত্যেকে সেই রকম এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল বাঁধিয়া পাখীর ঝাঁকের মত একটা পথ ধরিয়া চলে। কতকগুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের খেয়াল মত এক-একটা পৃথক্ পথ ধরিয়া ঘুরপাক দেয়। ইহাদের স্থান-অস্থান জ্ঞান নাই, সূর্য্যের রাজ্যের আনাচে-কানাচে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের যে-সব বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়াও এই ছোট পিণ্ডগুলিকে দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি যে সত্যই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে, জ্যোতিষীরা অন্য উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন।

যাহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করে, তাহাদের পায়ে পায়ে বিপদ্। মনে কর, তুমি চোক বাঁধিয়া

কলিকাতা, ঢাকা বা অন্য কোনো সহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া চলিয়াছ। এই অবস্থায় তোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ দেখি। হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাও, না হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীহ ভদ্রলোক চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাক্কা দিয়া ফেল। এলোমেলো-ভাবে যেখানে-সেখানে থাকিয়া চলা-ফেরা করে বলিয়া উল্কাপিণ্ডগুলিরও কখনো কখনো ঐ দশা হয়।

মনে কর, পৃথিবী তাহার চাঁদটিকে কাছে লইয়া সূর্য্যকে ঘুরিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে একটা উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই উল্কাপিণ্ডকে লইয়া পৃথিবী কি করিবে বলিতে পার কি? পৃথিবীর ভাবগতিক তোমাদের ত জানিতে বাকি নাই। ছোট জিনিসকে কাছে পাইলেই সে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে। তুমি যখন খুব জোরে আকাশের উপরে একটা ঢিল ফেল, তখন তাহার কি দশা হয় তোমরা দু'বেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী ঢিলকে টানিয়া মাটির উপরে ফেলে। ছোট ছোট উল্কাপিণ্ডগুলিও যখন নিজেদের পথে ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়া পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক্ ঢিলের দশাই হয়। পৃথিবী তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং তাহারা হু হু শব্দে বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ ষাইট্ মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, কাজেই এতটা

বাতাস ভেদ করিয়া উল্কাপিণ্ডগুলিকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশা কি হয় বলিতে পার কি? সেগুলি জ্বলিয়া উঠে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়িয়া ছাই হইয়া নিভিয়া যায়। আমরা পৃথিবী হইতে উল্কাপিণ্ডের ঐ জ্বলা-পোড়াকে হাউই বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাসের ঘসা পাইয়া কেমন করিয়া উল্কাপিণ্ডের মত জিনিস জ্বলিবে? কিন্তু এই রকমে যে অনেক জিনিস জ্বলে ইহা আমাদের জানা কথা।

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা বা গুলি বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তোমরা হয় ত বলিবে কামানের ভিতরকার বারুদের আগুন তাহাদিগকে গরম করে। কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় বটে, কিন্তু সে আগুন গোলা বা গুলিকে গরম করিতে সময় পায় না। আগুন হইবামাত্র গোলা বাতাস ভেদ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাতাসের ঘসা পাইয়া এই সকল ঠাণ্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে পড়িলে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা সেকেণ্ডে দুই মাইলের বেশি যাইতে পারে না, কিন্তু উল্কাপিণ্ডগুলি চলে সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল করিয়া। তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, বাতাসের ঘর্ষণে পথের মাঝে

উল্কাপিণ্ডগুলির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া একটুও আশ্চর্য্য নয়।

উল্কাপিণ্ড যে সত্যই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, তাহাদের পড়ার সময়ে ভাল করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে। যে পথে উল্কাপিণ্ড নামিয়া আসে অনেক সময়ে সেখানে এক রকম আলো দেখা যায়। উল্কা নিভিয়া গেলেও কিছুক্ষণ ঐ আলো আকাশের গায়ে থাকে। জ্যোতিষীরা বলেন, গরম হইয়া পুড়িতে আরম্ভ করিলেই উল্কার দেহ হইতে বাষ্প বাহির হয় ও তাহা জ্বলিতে থাকে। কিন্তু এই বাষ্পকে উল্কারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহা পথের মাঝেই ছড়াইয়া থাকে। কাজেই উল্কাগুলি জ্বলিয়া-পুড়িয়া নিভিয়া গেলে ঐ জ্বলন্ত বাষ্প কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে আলো করিয়া রাখে।

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা মনে করিতেছ, সব উল্কাই বুঝি পুড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া যায়। কিন্তু তাহা নয়। যেগুলি আকারে বড় তাহারা বাতাসের ঘষা পাইয়া নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবার সময় পায় না,—তাহাদের আধ্‌পোড়া দেহ কখনো কখনো ভয়ানক বেগে মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পুঁতিয়া যায়। তখন মাটি খুঁড়িয়া সন্ধান না করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না।

কলিকাতার যাদুঘরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা যখন যাইবে তখন খোঁজ করিয়ো,—দেখিবে, ঐ-রকম আধ্‌পোড়া

উল্কাপিণ্ড সেখানে অনেক সাজানো আছে। কোন্ সময়ে কোথায় সেগুলিকে পাওয়া গিয়াছিল তাহাও লেখা আছে দেখিবে। এই পিণ্ডদের ওজন নিতান্ত অল্প নয়। এক ছটাক দু-ছটাক হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো কোনো পিণ্ডের ওজন পঁচিশ ত্রিশ মণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

কোনো জিনিসকে পোড়াইলে তাহা কোথায় যায় বলিতে পার কি? তোমরা হয় ত বলিবে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহারই উল্টা কথা। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জিনিসেরই ক্ষয় নাই। তুমি যখন একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তখন মনে হয় বুঝি কাঠখানি নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণু-পরমাণুর একটিও ক্ষয় পায় না। কাঠের কতক অংশ জল হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়, নানা রকম গ্যাস হইয়া কতক বাতাসে মিশিয়া যায়, কতক ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। ঐ জলই জমা হইয়া হয় ত বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে এবং বাষ্প-গুলিও নানা আকারে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

তাহা হইলে দেখ,—যে উল্কাপিণ্ডগুলি বাষ্প হইয়া আকাশে পুড়িয়া যায়, তাহাদের এক কণাও নষ্ট হয় না। দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো কখনো জমাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া আসে। মেরুপ্রদেশের বরফের উপরে উঁচু পাহাড়ের মাথায় এবং সমুদ্রের তলায় খোঁজ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা উল্কার দেহের

ছাই-ভস্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারিদিকের বাতাসে সর্ব্বদাই যে ধূলির কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতেও উল্কাদের ছাই দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর বাতাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; সুতরাং এই সব ছাইয়ের কণায় যে আমাদের আকাশ সত্যই ভরা রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার পড়িবার টেবিলের উপরে যে বই সাজানো আছে, দু'দিন না ঝাড়িলে তাহাতে কত ধূলা জমা হয় দেখ নাই কি? ইহার পনেরো আনাই হয় ত রাস্তার ধূলা, কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু কিছু উল্কাপিণ্ডের ছাই মিশানো থাকা একটুও বিচিত্র নয়।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতি দিবা রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশে অন্ততঃ দুই কোটি ছোট বড় উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করে। এই কথা যদি সত্য হয়,—ভাবিয়া দেখ, এই সব উল্কার দেহের ছাই পরিমাণে কত বেশী।

বৎসরের মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উল্কাপাত হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাসের ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে যদি আকাশটিকে পরিষ্কার পাও, তবে ঐ কয়েক তারিখের রাত্রিতে তোমরা অনেক উল্কাপাত দেখিতে পাইবে। নভেম্বর মাসটা আমাদের হেমন্তকাল। এই সময়ে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। নভেম্বরের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং ২৭শে এই চারি তারিখে রাত্রি জাগিয়া যদি তোমরা আকাশ

দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে অনেক উল্কা হাউই বাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উল্কাবৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। তখন আমি তোমাদের চেয়েও ছোট। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে এত উল্কা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। বোধ হয় নভেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে এই ঘটনা হইয়াছিল। বড় হইয়া বৎসরে বৎসরে উল্কাবৃষ্টি দেখিবার জন্য রাত্রি জাগিয়াছি, কিন্তু তেমনটি আর দেখিতে পাই নাই। তবুও তোমরা নভেম্বরের ঐ চারিটি দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উল্কাপাত নজরে পাড়বে। জ্যোতিষের বইতে পড়িয়াছি, ইংরাজি ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসের একদিন নাকি ভয়ানক উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমাদের জন্মও হয় নাই, কাজেই তাহার কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না।

বৎসরের তিন শত পঁইষট্টি দিনের মধ্যে কেন চার পাঁচটি তারিখে বেশি বেশি উল্কাপাত হয়, এখন তোমাদিগকে তাহার কারণ বলিব।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক উল্কাপিণ্ড গ্রহদের মত এক-একটা নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। ইহাদের সকলেই পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া একা একা চলে না,

লক্ষলক্ষ কোটিকোটি উল্কাপিণ্ড পাখীর ঝাঁকের মত দল বাঁধিয়াও ঘুরিয়া আসে।

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঐ রকম একটা উল্কাপিণ্ডের ঝাঁকের কাছে উপস্থিত হইল। সে দিন কি হইবে বলিতে পার কি? লক্ষলক্ষ উল্কা সে দিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকিবে এবং পৃথিবী তাহাদিগকে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করিবে। কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উল্কাবৃষ্টি দেখা যাইবে।

বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে কেন এত উল্কাপাত হয়, এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। পৃথিবী তাহার নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কয়েক দিনে এক একটা উল্কার ঝাঁকের ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত উল্কাবৃষ্টি।

উল্কাদের ঝাঁক কোন্ পথে ঘুরিতেছে জ্যোতিষীরা তাহা ভাল করিয়া জানেন। কাজেই ঠিক্ কোন্ তারিখে পৃথিবী ঐসব ঝাঁকের মাঝে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ইঁহারা হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। এই হিসাব হইতেই উল্কাবর্ষণের তারিখ আমরা ঠিক্ জানিতে পারি।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বৎসরে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা উল্কাবৃষ্টি হয়। এসম্বন্ধে একটা বড় আশ্চর্য্য কথা জ্যোতিষীদের কাছে শুনা যায়।

পঞ্চাশ বৎসর আগে জ্যোতিষীরা নভেম্বর মাসে কতদিন

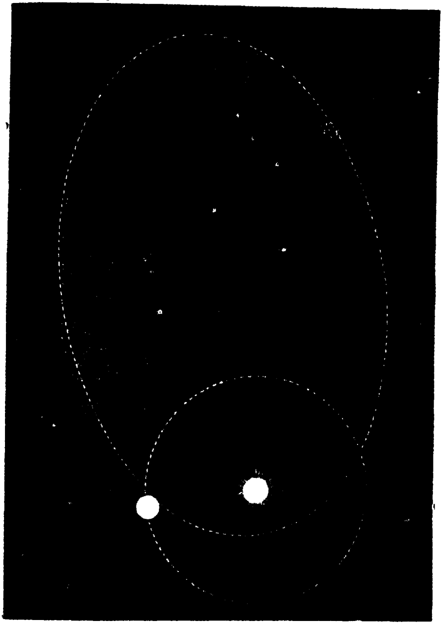
আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো বৎসরেরই তাঁহারা ২৭শে তারিখে উল্কাবৃষ্টি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি ১৮৭২ সালের ঐ তারিখে আকাশের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ (এনড্রোমিডা-মণ্ডল) হইতে হঠাৎ অবিরাম উল্কাবৃষ্টি হইতে দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। কোনো একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্ হই এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভুলিয়া যাই, বৈজ্ঞানিকেরা কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সে রকমে ভুলিয়া যান না। তাঁহারা কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং যত দিন ঠিক্ কারণটি জানা না যায়, তত দিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ২৭শে নভেম্বরের উল্কাবৃষ্টি দেখিয়া জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি কারণে হঠাৎ এই ব্যাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্যোতিষীই তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বায়েলার ধূমকেতুর কথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সূর্য্যের রাজ্যে আসিয়া তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাহার লেজ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মুণ্ড ভাঙিয়া দু'খানা হইয়াছিল; এবং শেষে ১৮৫৭ সালে সূর্য্য ও গ্রহদের টানে তাহার দেহটি পর্য্যন্ত গুঁড়া হইয়াছিল। এই ধূমকেতুটি কোন পথ দিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসিত, তাহা জ্যোতিষীদের জানা ছিল। হিসাব করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী প্রতি বৎসরের

২৭শে নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধূমকেতুর পথ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—ঐ দিন যে-সকল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, সেগুলি বায়েলারই দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুণ্ড নাই, অবয়ব নাই, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো আছে। কাজেই প্রতি বৎসর ২৭শে নভেম্বর তারিখে যখন পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া ঐ রাস্তার মাঝে দাঁড়ায়, তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি ঝুপঝাপ করিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া ইহা দেখি এবং বলি উল্কাবৃষ্টি হইতেছে।

তোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে কিনা জানি না। যদি না বুঝিয়া থাক, পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ছবিটি দেখিলে বুঝিবে।

ছবিতে ডিমের মত যে চওড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা বায়েলার ভ্রমণ-পথ। বায়েলার ধূমকেতুর দেহ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, তাই রাস্তায় সেই গুঁড়া ছড়ানো আছে। তার পরে যে গোল পথটি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন দেখ,—যেখানে বায়েলার পথের সহিত পৃথিবীর পথ কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবী হাজির হইয়াছে। এই অবস্থায় যে সত্যই হাজার হাজার উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমরা ছবি দেখিলেই



পৃথিবী ও উল্কাপিণ্ডের পথ

তাহা বুঝিবে। কিন্তু এ রকম ছোট ছোট শিকার কাছে পাইয়া পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না,

ঐগুলিকে টানিয়া সে মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার ক্ষুদ্র অংশ বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িবার সময়ে জ্বলিয়া-পুড়িয়া উল্কাবৃষ্টির উৎপত্তি করে।

বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উল্কাপাতের এই সম্বন্ধ জানা গেলে, জ্যোতিষীরা খুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বৎসরের অন্য দিনে যে-সকল উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়, তাহাদেরও কারণ বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় উল্কাবৃষ্টির দিনে পৃথিবী এক একটা ধূমকেতুর রাস্তায় গিয়া হাজির হয়। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, ধূমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত জমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উল্কাপিণ্ড লইয়াই তাহাদের দেহ। কাজেই যখন সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্য ভয়ানক বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে এবং হাড়গোড়-ভাঙা দেহকে গুছাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। হয় ত লেজের খানিকটা বা মুণ্ডের অর্দ্ধেকটা ছোট উল্কাপিণ্ডের আকারে রাস্তার যেখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকে। কাজেই যখন পৃথিবী জীবন্ত ধূমকেতুদের পথে হাজির হয়, তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উল্কাপাত হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত ছোট উল্কাদের কথাই বলিলাম। এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইয়া যায়,—ইহাদের একটিও মাটিতে

পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, তাহারা পুড়িতে পুড়িতে মাটিতে পড়ে। কেবল ইহাই নয়, কখনো কখনো ভয়ানক শব্দ করিয়া ভাঙিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া তবে মাটিতে পড়ে। পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো দেখা যায়, তাহা নানা রঙের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম বড় উল্কাপাত দেখিয়া থাকিবে। দেখিলে বোধ হয় যেন, হাউই বাজি তারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। এই বইয়ের প্রথমেই বড় উল্কাপাতের একটি ছবি দিয়াছি। দেখ,—সেটি কেমন সুন্দর!

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয়া যদি একটি ঢিল উপরে ছোড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে। যদি আকাশের দিকে বন্দুক ছোড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও ঐ দশা হয়,—খুব উপরে উঠে কিন্তু একটু পরে আবার মাটিতে নামিয়া আসে। ঢিল বা বন্দুকের গুলি পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে যদি একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকেও নিশ্চয় মাটিতে পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান।

মনে কর বড় বড় এন্‌জিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা খুব বড় রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত জোরালো হইল যে, তাহার গোলা পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া আকাশে উঠিল। এই অবস্থায় গোলাটির দশা

কি হইবে বলিতে পার কি? গোলা মাটিতে পড়িবে না, কারণ পৃথিবী তাহাকে টানিতেই পারিবে না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া বলেন, ঐ রকম গোলা চাঁদের মত পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে,—অর্থাৎ সে যেন পৃথিবীর একটি নূতন চাঁদ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাহার বেশি দিন থাকা চলিবে না ;—সূর্য্য তাহাকে বিলক্ষণ জোরে টান দিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই তাহাকে তখন গ্রহদের মত সূর্য্যেরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্ত ঐ রকম অদ্ভুত কামান প্রস্তুত করিয়া কেহই গোলা ছুঁড়িতে পারে নাই। কারণ গোলার গতি সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কখনই পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। আজকালকার খুব ভাল কামানের গোলা সেকেণ্ডে দুই মাইলের বেশি দৌড়িতে পারে না।

এখনকার অবস্থা যাহা হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন একটি সময় ছিল যখন সত্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি-পাথর ও নানা আকরিক বস্তু আকাশের উপরে উঠিত এবং পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া যাইত। তোমরা ইহা শুনিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইতেছ, কিন্তু কথাটি একবারে অসম্ভব নয়। জ্যোতিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে যেমন বিসুভিয়স্, এট্না প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি আছে, অতি প্রাচীনকালের অবস্থা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবী খুব গরম ছিল ; এজন্য অসংখ্য আগ্নেয় পর্ব্বত মাটি, পাথর,

লোহা, তামা প্রভৃতি জিনিস জোরে জোরে আকাশের উপর দিকে ছুড়িত। এই সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা পারও হইয়া যাইত। কাজেই তখন তাহারা পৃথিবীতে আর ফিরিতে পারিত না,—আমাদের সেই কামানের গোলার মত, ছোট গ্রহের আকারে সেগুলি সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইত। জ্যোতিষীরা বলেন, ঐ-সব বড় বড় আগ্নেয়-পর্ব্বতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে না থাকিলেও, তাহারা যে মাটি-পাথর এবং ধাতুপিণ্ড গোলার মত ছাড়িয়াছিল, তাহা আজও আকাশে আছে এবং দিবা-রাত্রি সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী নিজের পথে আপন মনে চলিতে চলিতে যখন এইগুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগকে আর ছাড়িতে চায় না,—জোরে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে সুরু করে। জ্যোতিষীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিণ্ডগুলি যখন এই রকমে বাতাস ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে জ্বলিয়া উঠে, আমরা তখনি তাহাদিগকে বড় বড় উল্কাপাতের মত দেখি।

পৃথিবীর নানা জায়গায় উল্কাপিণ্ডের যে সব অংশ কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কি কি জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষায় তাহাতে একটিও নূতন দ্রব্য ধরা পড়ে নাই। পৃথিবীর লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং মাটি-পাথর-বালি প্রভৃতি অ-ধাতু জিনিসই পাওয়া গিয়াছে। উল্কাপিণ্ডগুলি যে এককালে সত্যই পৃথিবীর উপরকার বস্তু ছিল, ইহা দেখিয়াও কতকটা বুঝা যায় না কি?

নক্ষত্র

সূর্য্য-জগতের কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি; তার পরে যে-সব টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিস কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের কথাও বলিলাম। এখন সূর্য্যের রাজ্যের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের খবর তোমাদিগকে একটু-একটু দিব।

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি? কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে! এরা সকলেই সূর্য্য-জগতের বাহিরে জ্যোতিষ্ক। কোনোটা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া আলো দেয়, কোনোটা মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলে। তাহাদের রঙই বা কত রকমের। কোনোটার রঙ্‌ তারা-বাজির মত ধপ্‌ধপে সাদা, কোনোটা হল্‌দে, আবার কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় ত বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট। মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের যে একটু আলো আসিতেছে, ইহাদের আলো যেন তাহার চেয়েও অল্প। আকাশের আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে যেন বড় নক্ষত্রদের বাজার বসিয়া গিয়াছে,—ছোট নক্ষত্রদের মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ্‌ ডগ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

উপর দিকে তাকাইয়া দেখ,—সাদা জল লইয়া গঙ্গা নদীর মত যেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে

আরম্ভ করিয়া মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিয়াছে এবং তাহার স্রোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসিতেছে। লোকে ইহাকে ছায়াপথ বলে। বাস্তবিকই ইহা যেন স্বর্গের পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছায়া নাই; দেবতাদের পায়ের স্পর্শে ইহার ধূলামাটি সবই আলোর গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কত হাজার হাজার তারা ঐ পথের যাত্রী হইয়া পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে, দেখিতে পাও না কি? ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক্ করিতে পার কি?

আকাশের আর এক দিকে তাকাইয়া দেখ,—ঠিক যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া একটা চাক বাঁধিয়াছে এবং তাহার চঞ্চল আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এ যেন আকাশের গলার একখানা ধুক্‌ধুকি! দূরে আকাশের গায়ে যে এক টুক্‌রা সাদা মেঘের মত দেখা যাইতেছে,—আমরা বোধ হয় ভাবিতেছে উহা মেঘ। কিন্তু তাহা নয়, অতি দূরের নক্ষত্রেরা ঐখানে জটলা পাকাইয়া আছে। তাই তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো জমাট বাঁধিয়া যেন একখণ্ড মেঘের সৃষ্টি করিয়াছে। দূরবীণ্ দিয়া দেখিলে হাজার হাজার নক্ষত্র ঐ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে!

আকাশের এই মূর্ত্তি কি তোমরা কখনো দেখ নাই? যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক,—যে রাত্রিতে আকাশে চাঁদ থাকিবে না, কুয়াসা ধোঁয়া মেঘ কিছুই থাকিবে না,—তখন একবার আকাশখানিকে দেখিয়া লইয়ো। এবং সেই সময়ে

মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়,—প্রত্যেকেই এক-একটি মহা-সূর্য্য ; আমাদের সূর্য্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় এবং শত শত গুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায়!

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-সূর্য্যের কেহই একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দূরত্বই বা কত! হাজার দু'হাজার লক্ষ বা কোটি মাইল দিয়া তাহা মাপা যায় না! ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর!

তোমরা যদি এই রকম চিন্তা করিয়া আকাশটিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে এই সৃষ্টিখানি কত বড় এবং যিনি এই সৃষ্টিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, তাঁহার শক্তিই বা কি অপরিমেয়।

দীপালির দিন আসিয়াছে; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত শত দীপ জ্বলিয়াছে; গ্রামখানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে তোমরা বাড়ির ছাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন যদি দূরের একখানি বাড়ির হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার? কখনই পার না। কারণ তাহাতে আলো কমে না এবং আলোর শ্রেণীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে

দীপালির উৎসব চলিতেছে! জ্যোতিষীরা বলেন, তাহারি কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সূর্য্য একখানি ছোট প্রদীপ! সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠাৎ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটুও ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহারা হয় ত সূর্য্যের এই অপমৃত্যুর খবরটা পর্যান্ত জানিতে পারিবে না। অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় আমাদের সূর্য্য কত ছোট ভাবিয়া দেখ। সেই সূর্য্যের একটি অতি ছোট গ্রহের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমরা এক একটি মানুষ!

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনন্ত মহা-সূর্য্যের মধ্যে যে-মানুষ এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সত্যই মানুষ অসংখ্য নক্ষত্রের খবর দিতে পারে না; তাহার বুদ্ধিজ্ঞান যন্ত্রতন্ত্র সৃষ্টির বিশালতা ও সীমা ঠিক্ করিতে গিয়া হার মানে। সে তখন স্তব্ধ হইয়া এই বিশ্বের মহিমা দেখে এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব; কাজেই সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়া দিতে পারে না; যাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে চায়। এই রকমে অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্র-লোকের অনেক টুক্‌রা-টুক্‌রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে। আমরা তাহাদেরি খবর একটু-আধটু তোমাদিগকে জানাইব।

নক্ষত্রদের সংখ্যা

যে-সব নক্ষত্রকে আমরা এক-একটা সূর্য্যের চেয়ে বড় বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দূরে আছে বোধ হয় এই খবরগুলিই তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিতেছ।

সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,—গুণিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি চোখে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের গুণা যায় না। এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক্ করা হইয়াছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকর্ম্মা লোক কে আছে যে, সমস্ত জীবনটা নক্ষত্র গুণিয়াই কাটাইয়া দিবে! কিন্তু অনেক দিন আগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন, এবং সমস্ত আকাশে ছয় হাজারের বেশি তারা দেখিতে পান নাই। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় হাজারের অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা একসঙ্গে অর্দ্ধেক আকাশটাকেই দেখি, আর অর্দ্ধেক পৃথিবীর অন্যদিকে থাকে।

কিন্তু দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্যোতিষীরা এই রকমে পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, এই সৃষ্টিখানি কত প্রকাণ্ড। কিন্তু এই সংখ্যার

অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বলা যায় না। যেমন বড় বড় দূরবীণ প্রস্তুত হইতেছে, আমাদের জানা-শুনা নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোট দূরবীণে আকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, বড় দূরবীণে চোখ লাগাইয়া এখন জ্যোতিষীরা সেখানেই হাজার হাজার নক্ষত্র খুঁজিয়া পাইতেছেন। বড় দূরবীণে যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, দূরবীণ দিয়া সেখানকার ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্যোতিষীরা ছবিতে হাজার হাজার নূতন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছেন। কাজেই হয় ত কোনো দিন আর এক রকম যন্ত্র দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিবেন, নক্ষত্রদের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি নয়,—এক শত কোটি। নক্ষত্রদের সত্যই সংখ্যা হয় না!

নক্ষত্রদের দূরত্ব

এই ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের দূরত্বের কথা আরো আশ্চর্য্য! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাড়া আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিষীরা স্থিরই করিতে পারেন নাই। এই পঞ্চাশটিই আমাদের কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে দূরত্ব স্থির করিতে গিয়া আমাদের যন্ত্র-তন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে।

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়া হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী হইতে সূর্য্য বা নেপচুন যত দূরে আছে, উহারা বুঝি তাহারি হাজার বা লক্ষ গুণ দূরে আছে। কিন্তু তাহা নয়। যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহারি দূরত্বের কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে।

একটা জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কত দূরে আছে ঠিক্ করিবার জন্য অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,—কেহ ইঞ্চি, ফুট, গজ দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে। দূরত্ব বেশি হইলে, ছোট মাপ-কাঠিতে কুলায় না। তখন মাইল বা ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্তু নক্ষত্রেরা যে রকম দূরে আছে, তাহার হিসাব করিতে গেলে মাইলেও কুলায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিষীরা এক মজার মাপ-কাঠি প্রস্তুত করিয়াছেন।

যেমন রেলের গাড়ী বা বন্দুকের গুলি এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতে সময় লয়, তেমনি আলো

এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পৌঁছিতে কিছু সময় কাটাইয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। মনে কর, তুমি ঘরের এক কোণে একটা আলো জ্বালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, ঘরের এক কোণে আলো জ্বালাইবা মাত্র সেই আলো আর এক কোণে তখনি পৌঁছায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আলো যাইতে একটু সময় লয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আলো এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ,—আলো এই বেগে চলিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে আট বার ঘুরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের ঘরগুলি দশ হাত না হয় ত্রিশ হাত লম্বা। কাজেই ঘরের এক কোণ হইতে আর এক কোণে পৌঁছিতে যে, আলো সময় লয় তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।

সূর্য্য কত দূরে আছে তাহা তোমরা জান; বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল করিয়া চলিয়া সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে প্রায় আট মিনিট সময় লয়। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, যদি এখনি সূর্য্য-লোকে একটা বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহা আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আট মিনিটে উহার আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে তবে তাহার খবর জানিতে পারি। পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরে আছে, নক্ষত্রেরা তাহারই কোটি

কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে কত সময় লয়।

এই রকমে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে পড়িতে তিন বৎসরের বেশি সময় লয়। আর যাহারা খুব দূরের নক্ষত্র, তাহাদের আলো আসিতে দুই শত, পাঁচ শত, এমন কি হাজার দু'হাজার বৎসরও লাগে। কি ভয়ানক দূরত্ব! দূরের নক্ষত্রে আজ যে আলো জ্বলিল, তাহা এক হাজার বা দু'হাজার বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিবে,—ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নয়? এই দূরত্বকে কি কেহ কখনো মাইল বা ক্রোশে হিসাব করিয়া বইতে লিখিতে পারে? লিখিতে গেলে বইয়ের একখানা পাতাই বোধ হয় অঙ্কে অঙ্কে ভরিয়া যায়। এই জন্যই জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের দূরত্ব মাইলে বা ক্রোশে হিসাব না করিয়া, তাহাদের আলো কত বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন।

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া যাহাদের দূরত্ব জানা আছে, তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সময় লয় জানা গিয়াছে। ধ্রুব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসিতে পথের মাঝে সাড়ে ছয়চল্লিশ বৎসর কাটাইয়া দেয়।

নক্ষত্রদের অবস্থা

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আকাশের নক্ষত্রদের দূরত্ব যখন এত বেশি তখন তাহারা কি প্রকার অবস্থায় আছে বুঝি আমাদের জানা নাই। কিন্তু জ্যোতিষীদের ক্ষমতা আশ্চর্য। যে-সব নক্ষত্রদের দূরত্ব বা আকার কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তাঁহারা একটি যন্ত্র দিয়া উহাদের অনেক খবরই বলিয়া দিয়াছেন। আলো পরীক্ষা করাই এই যন্ত্রের কাজ। কোন কোন জিনিস জ্বলিয়া আলো দিতেছে এবং ঐ-সব জিনিস কঠিন, তরল বা বাষ্প তাহা ঐ যন্ত্রে আলো পরীক্ষা করিয়া ঠিক করা যায়। এই রকমে জ্যোতিষীরা ঠিক করিয়াছেন, নক্ষত্রেরা সূর্য্যের মত নিজে-নিজেই উজ্জ্বল এবং ভয়ানক গরম। ইহাদের দেহে প্রথমে ধূমকেতুদের দেহের ন্যায় কেবল ছোট উল্কাপিণ্ড থাকে। পরে এই পিণ্ডগুলি পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া এমন গরম হইয়া পড়ে যে, শেষে জ্বলিয়া উঠে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্নিকাণ্ডেরই আলো। কিন্তু যে জিনিস জ্বলে ও পোড়ে তাহা কখনই কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে না—প্রথমে গলিয়া তরল হয় শেষে বাষ্পের আকার পায়। জ্যোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স হইয়াছে, তাহারা সত্যই এই রকম জ্বলন্ত বাষ্পের আকারে আছে। ইহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের সূর্য্যের মত।

সূর্য্যের মত ইহারা সাদা আলো দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক তাপ ছাড়িতে থাকে। ইহাদের চেয়েও যে-সব নক্ষত্রের বয়স বেশি, তাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উল্কা বা বাষ্প বেশি থাকে না। দেহের সব জিনিসই একাকার হইয়া শরীরের ঠিক্ মাঝ জায়গায় জমাট বাঁধিতে থাকে,—কেবল বাহিরেই একটা বাষ্পের আবরণ থাকিয়া যায়। এই অবস্থাতেও নক্ষত্রেরা জ্বলে এবং আলো দেয়, কিন্তু আলো সাদা হয় না,—হল্‌দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে। আকাশে এ রকম রঙিন নক্ষত্রের অভাব নাই।

যমক নক্ষত্র

তোমরা গল্পে শুনিয়াছ, মহাপ্রলয়ের দিনে আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইবে এবং আমাদের পৃথিবীখানি নাকি সেই বারোটা সূর্য্যের তাপে ভস্ম হইয়া যাইবে। গল্পটি কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবীণ দিয়া আজও দ্বাদশ সূর্য্যের খবর জানিতে পারি নাই। তোমরা হয় ত বলিবে, আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড় গাদা গাদা নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইহারা কি দ্বাদশ সূর্য্যের চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয়? জ্যোতিষীরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ছায়াপথের উপরে বা অন্য কোনো জায়গায় নক্ষত্রদিগকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা কাছাকাছি থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে জ্যোতিষীদের কথা তোমরা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তুমি একটা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া আছ; আধ্ মাইল দূরে একটা তাল-গাছ আছে এবং তার ঠিক্ পিছনে এক মাইল দূরে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। এখন তুমি যদি বাড়িখানি ও তাল গাছটির দিকে তাকাইতে থাক, তাহা হইলে উহাদিগকে কি রকম দেখিবে? তাল গাছটিকে বাড়ির গায়ে লাগানো দেখা যাইবে না কি? জ্যোতিষীরা বলেন, গাছ ও বাড়ির মধ্যে এক মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা দূর হইতে যেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানো দেখি,—নক্ষত্রদের

মধ্যে কোটি কোটি মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা সাম্নে দাঁড়াইয়া উহাদিগকে ঠিক ঐ রকমেই কাছাকাছি দেখি।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না।

কাছাকাছি হাজার সূর্য্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং দ্বাদশ সূর্য্যদেরও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা অনেক জোড়া জোড়া সূর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সূর্য্যকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দূরবীণে এগুলিকে দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে ইহাদিগকে জোড়া বলিয়া বোধ হয় না, দূরবীণে যুগল-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে। ইহারা সত্যই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সূর্য্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জোড়া সূর্য্যের উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু অদ্ভুত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে হাজার যমক সূর্য্য আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন।

নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ?

পাৎলা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রদের আলো কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,—মেঘগুলাই উহাদের আলো আট্‌কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অথচ নক্ষত্রদের আলো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই রকমটি তোমরা দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরাও ইহা দেখিয়াছিলেন এবং আজ-কালকার জ্যোতিষীরাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যখন-তখন ঐ রকমে নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়া-কমা হয়। কোনো নক্ষত্রে এই পরিবর্ত্তন দেখিবার জন্য সত্তর বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্ত্তন আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখা যায়।

পারস্যুস্ রাশিতে "আল্‌গল্" নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারা আছে ; সেটির আলো প্রায় তিন দিন অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তখন তাহাকে একেবারে মিট্‌মিট্ করিতে দেখা যায়। অদ্ভুত নয় কি ? আরব দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে "দৈত্য তারা" বলিতেন। অবশ্য তাঁরা আলো পরিবর্ত্তনের কারণ

মধ্যে কোটি কোটি মাইল তফাৎ থাকিলেও আমরা সাম্‌নে দাঁড়াইয়া উহাদিগকে ঠিক ঐ রকমেই কাছাকাছি দেখি।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না।

কাছাকাছি হাজার সূর্য্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং দ্বাদশ সূর্য্যাদেরও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা অনেক জোড়া জোড়া সূর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সূর্য্যকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দূরবীণে এগুলিকে দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে ইহাদিগকে জোড়া বলিয়া বোধ হয় না, দূরবীণে যুগল-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটি নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে। ইহারা সত্যই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সূর্য্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জোড়া সূর্য্যের উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু অদ্ভুত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে হাজার যমক সূর্য্য আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন।

নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ?

পাহলা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রদের আলো কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,—মেঘগুলাই উহাদের আলো আট্‌কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অথচ নক্ষত্রদের আলো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই রকমটি তোমরা দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরাও ইহা দেখিয়াছিলেন এবং আজ-কালকার জ্যোতিষীরাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যখন-তখন ঐ রকমে নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়া-কমা হয়। কোনো নক্ষত্রে এই পরিবর্ত্তন দেখিবার জন্য সত্তর বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্ত্তন আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখা যায়।

পারস্যুস্ রাশিতে "আল্‌গল্" নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারা আছে ; সেটির আলো প্রায় তিন দিন অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তখন তাহাকে একেবারে মিট্‌মিট্ করিতে দেখা যায়। অদ্ভুত নয় কি ? আরব দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে "দৈত্য তারা" বলিতেন। অবশ্য তাঁরা আলো পরিবর্ত্তনের কারণ

জানিতেন না, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতেন। সিটস (Cetus) নক্ষত্রমণ্ডলের একটা তারার নাম "মাইরা"। তোমরা নক্ষত্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকে অনায়াসে বাহির করিতে পারিবে। এটি আরো মজার নক্ষত্র। সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্তু দশ মাস অন্তর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন তাহাকে খালি চোখে দেখাই যায় না,—দেখিতে গেলে চোখে দূরবীণ লাগাইতে হয়। মজার ব্যাপার নয় কি?

আজকালকার জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের এই রকম আলো কমা-বাড়া দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—ইহার কারণও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল জীবন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, তার চেয়ে অনুজ্জ্বল মরা নক্ষত্রই আকাশে বেশি আছে। জন্ম-মৃত্যুকে কেহই এড়াইতে পারে না। আজ যে সূর্য্য এত তাপ-আলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তখন তাহার তাপ ও আলোর ভাণ্ডার একেবারে খালি হইয়া পড়িবে,—সূর্য্য নিভিয়া যাইবে। আমাদের চাঁদ ও বুধগ্রহ এই রকমেই নিভিয়া মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই এবং নিজেদের আলো দিবার ক্ষমতাও নাই। পৃথিবী, মঙ্গল ও শুক্রেরও সেই দশা উপস্থিত হইতেছে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা যেন গ্রহ-নক্ষত্রদের শ্মশান-ক্ষেত্র। জীব-জন্তু গাছ-পালা মরিলে পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া ফেলে বা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। কাজেই তাহাদের মৃতদেহের একটু চিহ্নও পৃথিবীর উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে হাজার হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, তাহারা ত এ রকমে নষ্ট হইতেছে না; মরিয়া গেলেও তাহাদের শুক্‌নো হাড়গোড়-সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহগুলা আকাশের অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকিতেছে। জীবন্ত নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখ্যার একটা আন্দাজ করা চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখ্যাই হয় না, অনন্তকাল ধরিয়া তাহারা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে।

যাহা হউক আমরা নক্ষত্রদের যে আলোর বাড়া-কমার কথা বলিলাম, তাহা এই মরা নক্ষত্রদেরই কাজ। জ্যোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে তাহাদের সকলেই যমক-তারা; কিন্তু ইহাদের দুটাই জীবন্ত নক্ষত্র নয়,—একটা মরা এবং আর একটা জীবন্ত। মরা নক্ষত্রদের আলো থাকে না, থাকে কেবল জীবন্ত নক্ষত্রদেরই। কাজেই যখন কালো মরা নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জ্বল জীবন্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন সূর্য্য-গ্রহণের মত নক্ষত্রেও একটা ছোট-খাটো গ্রহণ হইয়া পড়ে। কালো নক্ষত্র যদি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া ফেলে, তাহা

হইলে সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হয় ; তখন আলো একেবারেই দেখা যায় না। যদি অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে আলোও অর্দ্ধেক বা সিকি কমিয়া আসে। জ্যোতিষীরা বলেন, জীবন্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম ঢাকাঢাকি ও লুকোচুরি খেলাতেই তাহাদের আলোর বাড়া-কমা দেখা যায়।

নক্ষত্রদের জন্ম

মরার কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো বলা হয় নাই। জন্ম ও মৃত্যু বড় মজার ব্যাপার; ইহারা ঠিক্ তালে তালে পা ফেলিয়া পাশাপাশি না চলিলে সংসার টিঁকিয়া থাকে না।

বোধ হয় আমার কথাটি বুঝিলে না। এই বাংলা দেশে যে দশ কোটি আন্দাজ লোক আছে, মনে কর আজ হইতে তাহাদের মৃত্যু রহিত হইয়া গেল, কিন্তু জন্ম যেমন চলিতেছে ঠিক্ সেই রকমেই চলিতে লাগিল। বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাটা কি হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি। তখন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার জায়গাটুকুও থাকিবে না,—মানুষে মানুষে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যাইবে। আবার মনে কর, যেন ভগবানের আজ্ঞায় বাংলাদেশের লোকেরা ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্তে যেমন মরিতেছে ঠিক্ সেই রকমই মরিতে লাগিল, কিন্তু কেহ জন্মিল না। তাহা হইলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ষাট্ বা সত্তর বৎসর পরে নিশ্চয়ই দেখিবে, বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—মানুষের নাম-গন্ধও নাই।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, জন্মমৃত্যু তালে তালে পা ফেলিয়া না চলিলে সংসার থাকে না। আমাদের বাংলার

মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঠিক্ সেই কথাই বলা চলে। নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ পাইয়া যদি কেবল মৃত্যুই থাকিত, তাহা হইতে এতদিনে এক একটি করিয়া সব তারা নিভিয়া গিয়া আকাশটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন মানিয়া লইতে হয়, মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জন্মমৃত্যু তালে তালে এক সঙ্গে চলে।

তোমারা হয় ত ভাবিতেছ, দূরবীণ খাটাইয়া বুঝি এখনি তোমাদিগকে নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখাইব। কিন্তু তাহা পারিব না। মানুষ বাঁচে কত বৎসর জান ত,—সত্তর আশী নব্বুই না হয় একশত বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা জন্মিয়া বড় হয়, বুড়ো হয় এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রকম একটি পোকার দল একটা পাড়া গাঁয়ে গিয়া কোমর বাঁধিয়া বলে, মানুষ কি রকমে জন্মে ও কি রকমে মরে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা কি সত্যই মানুষের জন্মমৃত্যু দেখিতে পায়। পাড়া গাঁয়ে রোজ মানুষের জন্মমৃত্যু হয় না। কাজেই আস্ফালন করিয়া বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার দলের ভবলীলা সংবরণ করিতে হয়;—জন্মমৃত্যু দেখিবে কে? নক্ষত্রদের তুলনায় মানুষের পরমায়ু ঠিক্ পোকার দলের পরমায়ুরই সমান। নক্ষত্ররা বাঁচে লক্ষ লক্ষ বৎসর,

মানুষ বাঁচে এক শত বৎসর। কাজেই আমরা যদি এই একশো বৎসরের পরমায়ু হাতে করিয়া এখনি দূরবীণ খাটাইয়া নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখিতে যাই, তাহা হইলে একটা হাসির ব্যাপার হয় না কি?

অল্পায়ু পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা যে সত্যই পোকার মত নয়, একথা বোধ হয় তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের খুব উচ্চ বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে। তা ছাড়া বর্ত্তমানকে দেখিয়া অতীত কালের কথা বেশ আন্দাজ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও সব দিক্ দেখিয়া শুনিয়া ঠিক্ জানিতে পারে। জ্যোতিষীরা বর্ত্তমানের নানা ঘটনা দেখিয়া এই রকমেই নক্ষত্রদের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

আকাশের কোনো এক জায়গায় হঠাৎ একটা নূতন নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহা শুক্র বা বৃহস্পতির মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া দু'মাস চার মাস পরে নিভিয়া গেল, এরকম ঘটনার কথা বোধ হয় তোমরা শুন নাই। আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই। জ্যোতিষীরা কিন্তু গত এক শত বৎসরে এই রকম সাত আটটি নক্ষত্র জ্বলিতে দেখিয়াছেন।

এই নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ডাক্তার এনডারসন্ ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী। ইংরাজি ১৯০১ সালে তিনি এই রকম একটি নূতন নক্ষত্রকে বাহির করিয়াছিলেন। কোথায় কিছু নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে

উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু চতুর্থ দিনে সেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাজার গুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, আকাশের ঐ জায়গায় কি ভয়ানক আগুনই জ্বলিয়াছিল। কিন্তু আগুন বেশি দিন থাকে নাই। জন্মের ঠিক পাঁচ ছয় দিন পরে নক্ষত্রটির আলো কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আট দিনে সেটি একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা দুই নক্ষত্রের এই রকম জ্বলা ও নিভা দেখা গিয়াছে।

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে যে দুটি নূতন নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, সেগুলির কথা আরো আশ্চর্য্য। এই নক্ষত্রগুলি হঠাৎ নিভিয়া যায় নাই, প্রায় এক মাস ধরিয়া তাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহারা আকাশে জ্বলিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষত্রের মত ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না। দূরবীণ দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাষ্পরাশি আকাশে জ্বলিতেছে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র জন্মিয়াই মরে না; কেহ কেহ বাঁচিয়াও থাকে।

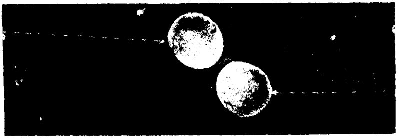
তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোণে একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল, এবং হয় ত মাস-খানেক থাকিয়া নিভিয়া গেল। তাহা লইয়া এত হাঙ্গামা কেন। কিন্তু চোখে একটুখানি দেখাইলেও ইহা কখনই সামান্য আগুন

নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল জুড়িয়া চলে। কাজেই জ্যোতিষীরা ঘটনাগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কেন আকাশের খালি জায়গায় হঠাৎ এই রকম আলো জ্বলে, তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর আলোচনা করিয়া তবে জানিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে জ্যোতিষীরা যাহা বলেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। উল্কাপিণ্ডেরা বাতাসের ভিতর দিয়া জোরে নামিবার সময়ে বাতাসের ঘসা পাইয়া জ্বলিয়া উঠে, একথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ; পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লাগিলে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়, তাহা হয় ত স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। জ্যোতিষীরা বলেন, নূতন নক্ষত্রের তাপ ও আলো সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিসের ঠোকাঠুকি হইতে উৎপন্ন হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মহাকাশে আবার এরকম ঠোকাঠুকি হইবে কি রকমে। কিন্তু আকাশে বড় জিনিসের অভাব নাই। যে-সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা নক্ষত্র মরিয়া গিয়া ভূতের মত আকাশের অন্ধকারে বেড়াইতেছে, তাহাদের কথা মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল গতিটুকুই আছে। কাজেই ভয়ানক বেগে ইহারা যখন পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। দু'খানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইলে কি হয়, তোমরা শুন নাই কি? তখন একখানা গাড়ীও আস্ত থাকে

না। যখন দু'টা বড় বড় মরা নক্ষত্র দু'দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন তাহাদেরও ঐ রকম দশা হয়। দু'টাই চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আগুন জ্বলে এবং আগুনে তাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতু সকলি জ্বলিয়া পুড়িয়া



ধাক্কার পূর্ব্বে

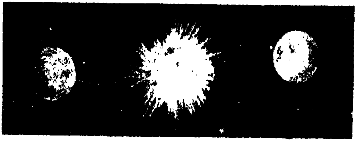
বাষ্প হইয়া পড়ে! এই জ্বলন্ত বাষ্পরাশিকেই আমরা দূর হইতে নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখি।



ধাক্কার সময়ে

মরা নক্ষত্রেরা কি রকমে ধাক্কা পাইয়া জ্বলিয়া উঠে এখানে তাহার দুইখানি ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিবে মরা নক্ষত্রেরা যখন পরস্পরকে একটুখানি ছুঁইয়া ধাক্কা দেয়, তখন তাহাদের সমস্ত দেহ ভাঙিয়া যায় না। কেবল যেটুকুতে

ধাক্কা লাগে তাহাই জ্বলে ও পোড়ে। কাজেই এ-রকম ঠোকাঠুকির আগুন বেশি দিন থাকে না, অল্প দিনের মধ্যে



ধাক্কার পরে

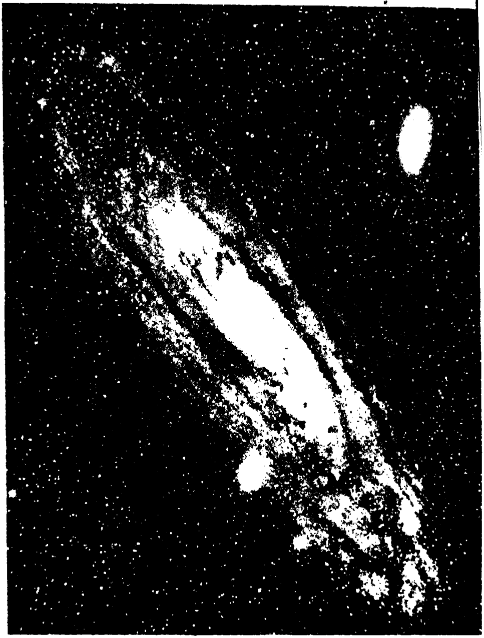
ঠাণ্ডা হইয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র একবারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাক্কা দেয়, তখন কাহারো রক্ষা থাকে না। নিমেষের মধ্যে দু'টাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া-চুরিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আগুন কয়েক দিনের মধ্যে কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একবারে নিভে না। রাবণের চিতার মত তাহা দাউ দাউ করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতে থাকে।

জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে এর্যান্ত যে-সকল নূতন নক্ষত্রের জন্ম দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল দুইটারই দেহ জ্বলিতে দেখা যাইতেছে। এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, এই মহাকাশে নক্ষত্রদের কেবল দু'টা চিতাই আছে। এই রকম আগুন আকাশের যেখানে-সেখানে দেখা যায়। যখন পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্য্যের জন্ম হয় নাই, এই এরকম প্রাচীন কালেও নক্ষত্রদের

ঠোকাঠুকি হইয়াছে এবং তখন যে-সব আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাঁচ হাজার জায়গায় এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীরা এগুলিকে নীহারিকা (Nebula) বলেন। নামটি যতই মিষ্টি হউক না কেন, এগুলি যে সত্যই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের চিতার আগুন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

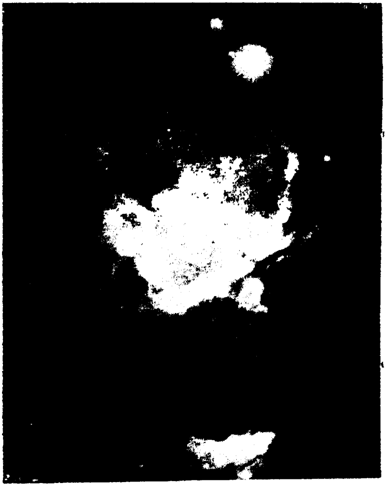
নীহারিকা

তোমরা বোধ হয় নীহারিকা দেখ নাই। ইহা আকাশের এক অদ্ভুত জিনিস। দূরবীণ ছাড়া এগুলিকে প্রায়ই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন দূরবীণের ভিতরে একখানি সাদা উজ্জ্বল মেঘ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এগুলি যে মেঘ নয় বা দূরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। বহু দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া যে বাষ্পরাশি জ্বলিতেছে, তাহাকেই আমরা উজ্জ্বল মেঘের মত দেখিতে পাই। তরল বা বাষ্পীয় জিনিসের কোনো নির্দ্দিষ্ট আকার থাকে না। নীহারিকার সর্ব্বাঙ্গে কেবল বাষ্প বা খুব ছোট ছোট জড়কণাই থাকে, এজন্য তাহাদের সকলকে একই নির্দ্দিষ্ট আকারে দেখা যায় না। কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, কোনোটি ইস্ক্রুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সব আকার দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নীহারিকাদের দেহের বাষ্পরাশি স্থির হইয়া নাই। ঝড়ের বাতাস যেমন ছুটাছুটি করে, ইহাদের দেহের বাষ্পরাশি ও জড়পিণ্ড যেন সেই রকমেই ছুটাছুটি করিতেছে ও ঘুরপাক খাইতেছে।



এনড্রোমিডা-মণ্ডলের নীহারিকা

এখানে আমরা দু'টি নীহারিকার ছবি দিলাম। প্রথমটি এন্‌ড্রোমিডা রাশির নীহারিকা। আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে, যেন ইহার দেহের বাষ্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার পথে পাক্ খাইতেছে। ইহা আকাশের যে পরিমাণ জায়গা জুড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের সূর্য্যের রাজ্যের মত অন্ততঃ দু'হাজার রাজ্য অনায়াসে থাকিতে পারে।

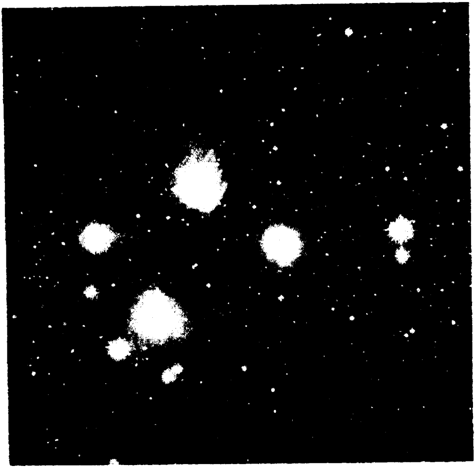


কালপুরুষের নীহারিকা

দ্বিতীয় ছবিটি "কালপুরুষের" (Orion) নীহারিকার

আকৃতি। কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্র আছে তাহাদেরি মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও আকাশের এক প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া জ্বলিতেছে।

ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকাগুলি কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডই করিতেছে!



কৃত্তিকা-মণ্ডলের নীহারিকা

আকাশে আগুনের অভাব নাই,—সূর্য্যে গ্রহ-উপগ্রহে ধূমকেতুতে উল্কাপিণ্ডে এবং নক্ষত্রে নক্ষত্রে যে কত আগুন

জ্বলিতেছে, তাহা কল্পনাই করা যায় না। কাজেই নীহারিকায় আগুন আছে বলিয়া জ্যোতিষীরা আশ্চর্য্য হন না,—ইহারা তাপ ত্যাগ করিয়া জমাট বাঁধিলে যে এক একটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা জানিয়াই অবাক্ হন।

তোমরা কোনো কারখানা-ঘর দেখিয়াছ কি? কুমোরের কারখানায় কুমোররা মাটি ছানিয়া কত রকমের হাঁড়ি কলসী ও পুতুল প্রস্তুত করে। কাঠের কারখানায় ছুতার মিস্ত্রিরা কাঠ দিয়া কত জিনিস নির্ম্মাণ করে। জ্যোতিষীরা বলেন, নীহারিকাগুলি বিধাতার এক-একটা কারখানা-ঘর। যে-সব জিনিসে সূর্য্য ও মহাসূর্য্যদের গড়া যাইতে পারে, তাহা নীহারিকাগুলিতে মজুত থাকে। তার পরে যখন ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে, তখন সেই-গুলিই এক-একটি সূর্য্য বা নক্ষত্রের সৃষ্টি করিতে থাকে।

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে তাহার অধিকাংশই নদী সমুদ্রে জমা হইয়া ক্রমে বাষ্প হয় এবং সেই বাষ্পই মেঘ হইয়া আবার বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। বৃষ্টি হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি, সৃষ্টির প্রথম হইতে চলিতেছে। জীবজন্তু গাছপালা মরিয়া মাটিতে মিশিয়া যায় এবং সেই মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নূতন জীবজন্তু গাছপালা বাঁচে। প্রকৃতির সব কাজেই এক রকম পুরাতন হইতে নূতনের সৃষ্টি দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্র-সূর্য্যদের জন্ম-মৃত্যুতে সেই নিয়মই চলে। যখন আকাশের মহাসূর্য্যগুলি

তাপ ও আলো ব্যয় করিয়া মরিয়া যায়, তখন আমরা ভাবি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় না,—মরা নক্ষত্রেরাই পরস্পরকে ধাক্কাধুক্কি দিয়া আবার জ্বলিয়া উঠে এবং এক-একটি নূতন নক্ষত্রের জন্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ বিধাতার কৌশল কি সুন্দর! যাহা পুরাতন এবং সংসারের সকল কাজের অযোগ্য তাহাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া নূতনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিখানি টিঁকিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্য নয় কি?

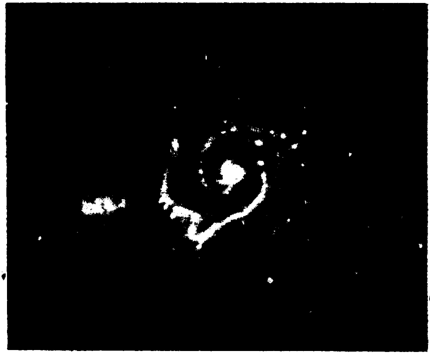
সূর্য্য-জগতের উৎপত্তি

সূর্য্য ও আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রেরা যে, একই রকমের জ্যোতিষ্ক, তাহা আগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি। সূর্য্য আমাদের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, এত তাপ ও আলো। নক্ষত্রেরা দূরে আছে, তাই তাহাদের তাপ বুঝা যায় না এবং আলো এত অল্প হয়।

তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, নক্ষত্রেরা যেমন এক-একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে, সূর্য্য ও তাহার উপগ্রহেরা ঠিক্ সেই প্রকার এক-একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে। তাহা হইলে দেখ,—যে পৃথিবীতে আমরা এখন বাস করিতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি তোমার আমার দেহের অণুপরমাণু একদিন প্রকাণ্ড নীহারিকার আকারে আকাশে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘুরপাক খাইত। কত দিন এই রকম জ্বলা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না,—হয় ত কোটি কোটি বৎসর চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা ঠাণ্ডা হইলে, একটা জিনিসেরই সৃষ্টি করিতে পারে; সূর্য্যের চারিদিকে যে ছোট-বড় আটটি গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি রকমে হইল? জ্যোতিষীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য।

সূর্য্য এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া আছে, তাহা কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। জ্যোতিষীরা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গা জুড়িয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি বড় নীহারিকা জ্বলিত এবং তাহার বাষ্পরাশি ঝড়ের বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে বাষ্পরাশি আকাশের এতটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহা কখনই খুব ঘন হইতে পারে না। ঐ নীহারিকার বাষ্প প্রথমে ঘন ছিল না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও হাল্কা ছিল।



ভেনেটিস মণ্ডলের নীহারিকা

এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম। এটি উত্তর আকাশের একটি নক্ষত্রমণ্ডলে (Canes Venetice) আছে,

আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেহের বাষ্পরাশি কি রকম বেগে পাক্ খাইতেছে। জ্যোতির্ষীরা অনুমান করেন, সূর্য্যের নীহারিকার হাল্কা বাষ্পরাশি এই রকমেই জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘুরিত।

কোনো গরম জিনিসকে ঠাণ্ডা করিলে কি হয় তোমরা তাহা আগে শুনিয়াছ ;—ঠাণ্ডা করিলে পূর্ব্বের আকার আর থাকে না, তাহা ছোট হইয়া আসে। লক্ষ লক্ষ বৎসর তাপ ছাড়িয়া সূর্য্যের নীহারিকার অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল,—সেটি আকারে ছোট হইয়া আগেকার চেয়ে অনেক জোরে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, আকারে ছোট হইল বলিয়া আগের চেয়ে কেন জোরে ঘুরিবে ? তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না। তোমরা বড় হইয়া যখন অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষিতে পারিবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবে।

মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কাদা দিয়া যেন একটি ভাঁটা বা বল্ প্রস্তুত করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাইয়া ভাঁটাকে জোরে ঘুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম ভাঁটার আকৃতি কি রকম হইবে একবার মনে ভাবিয়া দেখ দেখি। ঘুরপাক্ খাইয়া সেটি কখনই আগেকার মত গোলাকার থাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা হইয়া যাইবে। জ্যোতির্ষীরা বলেন, সূর্য্যের

নীহারিকা খুব জোরে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক্ ঐ দশাই হইয়াছিল;—উহার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্‌টা হইয়াছিল এবং শেষে চেপ্‌টার পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সমস্ত নীহারিকার খানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার মত আকৃতি লইয়া খসিয়া পড়িয়াছিল।

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, সূর্য্যের নীহারিকা হইতে চাকার মত একটা অংশ একবারই খসিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষীরা তাহা বলেন না। পুষ্করিণীর জলে ঢিল ফেলিলে, ঢিলের জায়গা হইতে কিরকম বার বার গোলাকার ঢেউ উৎপন্ন হয়, তোমরা কি তাহা দেখ নাই? মূল নীহারিকা হইতে এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সব চাকার বাষ্প ক্রমে ক্রমে জমাট্ বাঁধিয়া, নেপ্‌চুন্ ইউরেনস্ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই রকমে গ্রহদের সৃষ্টি হইলে মূল নীহারিকার যে অংশ মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই সূর্য্যের আকৃতি লইয়া গ্রহদের মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। গ্রহেরা আসল নীহারিকার যে-সকল অংশ পাইয়াছিল, তাহা অতি অল্প, তাই বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহেরা তাপ ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে; বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুনের দেহ বড় হইলেও তাহারাও প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের ভাগে আসল নীহারিকার যে অংশ পড়িয়াছিল, তাহা গ্রহদের



সর্পাকার নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও গ্রহাদির জন্ম

ভাগের মত অল্প ছিল না, তাই সূর্য্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে পারে নাই।

কোনো অখণ্ড নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও গ্রহদের সৃষ্টির যে কথা বলিলাম, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিলে কি না জানি না। এখানে যে দু'খানি ছবি দিলাম তাহা দেখিলে কতকটা বুঝিবে বলিয়া মনে করিতেছি।

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা হইতে এক একটা চাকার মত অংশ খসিয়াছিল, ২৯১ পৃষ্ঠার ছবিটি হইতে তোমরা তাহা বুঝিবে।

ছবির মাঝখানে সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে। ইহা ঘুরপাক্ খাইতে খাইতে প্রায় গোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা হইতে সকলের আগে যে চাকাটি বাহির হইয়াছিল, তাহার বাষ্প প্রায় সম্পূর্ণ জমাট বাঁধিয়া একটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা নেপ্‌চুন্। তার পরে যে চাকাটি আছে, তাহার সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,—জমাট বাঁধা শুরু হইয়াছে মাত্র। ইহা ইউরেনস্। এই সব ছাড়া সূর্য্যের গায়ে-লাগা আরো কতকগুলি চাকা ছবিতে দেখিবে,—এগুলি শনি বৃহস্পতি মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাঁধিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের বাষ্পরাশি এখনো ছড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয় ছবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে সূর্য্য-জগতের সৃষ্টির কথা তোমরা ভালো করিয়া বুঝিবে। বইয়ের পাতার ক্ষুদ্র জায়গাটুকু আকাশের দু'হাত দশ হাত জায়গা নয়, ইহার



নীহারিকারাশি হইতে সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম

প্রসার কোটি কোটি মাইল। সৃষ্টির আগে সেখানে জ্বলন্ত নীহারিকার বাষ্প ছুটাছুটি করিত ;—ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। এই আগুনের ঝড়ের মধ্য দিয়াই যে, আমাদের এমন সুন্দর পৃথিবীখানি জন্মিয়াছিল, একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা ইহাই শত শত বৎসর দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস করা যায় না।

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্ ও নেপচুনের জন্ম হইয়া গিয়াছে, তাহারা এখন নীহারিকার ঘূর্ণিপাক্ হইতে যেন দূরে পড়িয়া আছে। শনি ও বৃহস্পতিও প্রায় তাহাদের নিজের মূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বুধ এখনো নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে!

একটি অবয়বহীন জ্বলন্ত নীহারিকা হইতে এই রকম সূর্য্য ও গ্রহদের উৎপত্তি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি ?

নক্ষত্র-চেনা

আকাশে চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিষীরা তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু তাহা নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা নাম দিয়া কেতাবে ও নক্ষত্রদের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গোটা পঁচিশ নাম আমাদের মনে রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষত্রের নাম মনে রাখিবার জন্য বুঝি জ্যোতিষীরা রাত্রি জাগিয়া নাম মুখস্থ করেন। কিন্তু তাহা করিতে হয় না।

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভাবিয়া দেখ দেখি। গ্রামের কথা ছাড়িয়া তোমরা যদি বড় বড় সহরগুলির একটা হিসাব কর, তাহা হইলে সহরের সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি হয় না কি? কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা করি না। আমরা পৃথিবীকে কখনই একটিমাত্র দেশ বলিয়া মনে করি না, সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করি এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি। এই সব নাম আমাদের প্রায়ই মনে থাকে। মনে না থাকিলে ম্যাপ দেখিয়া বই খুলিয়া কোথায় কোন্ সহর আছে ঠিক করি।

নক্ষত্র চিনিবার জন্য জ্যোতিষীরা ঠিক্ ঐরকমই করেন। তাঁহারা সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্র-মণ্ডল বা রাশি বলেন।

তার পরে প্রত্যেক ভাগের কোথায় কোন্ নক্ষত্রটি আছে, আকাশের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের এক-একটা নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাঁহারা আকাশে সেই নক্ষত্র-মণ্ডলগুলিকে দেখান এবং তাহাদের মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়া দেন।

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে তাহা পড়িয়াছ। এক এক রাজা যে জায়গাটুকুতে রাজত্ব করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ যেটুকুতে রাজত্ব করেন, তাহা ভারতবর্ষ; কাবুলের আমীর যে অংশের রাজা তাহা আফগানিস্থান; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ-রকম রাজা নাই এবং রাজ্যও নাই; কাজেই জ্যোতিষীরা আর এক রকমে আকাশকে ভাগ করিয়াছেন।

নক্ষত্রগুলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গায় কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে। আর এক জায়গায় হয় ত দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চারি কোণা জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন মেঘের কত রকম আকৃতি কল্পনা করা যায় দেখ নাই কি? একটা মেঘকে হয় ত ঠিক্ হাতীর মত দেখা গেল,

কিছুক্ষণ পরে তাহা একটা গোরু বা বুড়ো মানুষের মত দাঁড়াইল। এ-রকম মেঘের খেলা অনেক সময়েই দেখা যায়। জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঐ রকমই এক-একটা অদ্ভুত আকৃতির কল্পনা করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশে রাস্তা বা রাস্তা না থাকিলেও, তাহার জায়গায় জায়গায় নক্ষত্রেরা মিলিয়া যে-সব আকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আছে। জ্যোতিষীরা এই-সব আকৃতিকে মনে রাখিয়া আকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন এবং কতকগুলি নক্ষত্র একত্র হইয়া আকাশের যেখানে একটা ভেড়ার মত চেহারা পাইয়াছে, তাহাকে মেষরাশি বলেন; যেখানে ষাঁড়ের মত চেহারা পাইয়াছে, তাহাকে বৃষরাশি বলেন এবং যেখানে বিছার মত আকৃতি করিয়াছে তাহাকে বৃশ্চিকরাশি বলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষত্র-মণ্ডলে সমস্ত আকাশ ভাগ করা রহিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, কোন্ কোন তারায় মিলিয়া আকাশের কোন অংশে মেষ, বৃষ, বিছা প্রভৃতির মত হইয়া আছে, জ্যোতিষীরা তাহাও ম্যাপে আঁকিয়া রাখেন। যাহারা নক্ষত্র চিনিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ম্যাপ দেখাইয়া আকাশের কোথায় মেষরাশি কোথায় বৃষরাশি আছে, জ্যোতিষীরা তাহা দেখাইয়া দেন।

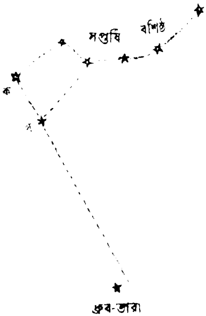
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে নক্ষত্র চেনা খুব শক্ত নয়। মনে কর, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জাপানের টোকিয়ো সহর কোথায়? যাহার ভূগোল জানা আছে, সে কানাডা

বেল্‌জিয়ম্ ইংলণ্ড বা চীন দেশে খোঁজ না করিয়া, প্রথমেই জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে আঙুল দিয়া দেখায়। সেই রকম যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বৃষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,—তাহা হইলে যাহার নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনো দিকে না তাকাইয়া আকাশের যেখানে বৃষরাশি আছে, তাহার খোঁজ করে এবং তার পরে সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়া ফেলে।

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজ্যের সংখ্যাও বেশি নয়। কিন্তু জ্যোতিষীরা আকাশকে যে-সব মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক। ক্যাল্‌ডিয়ান নামে এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের লইয়া সর্বপ্রথমে নানা আকৃতির কল্পনা করিতেন। মেষপালন ইঁহাদের কাজ ছিল। তাঁহারা এখনকার লোকদের মত লেখাপড়া জানিতেন না এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও বুঝিতেন না। বাঘ-ভল্লুকের মুখ হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা খোলা মাঠের মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া তাহাদের এক-একটা আকৃতি কল্পনা করিতেন। এই রকমে তাঁহারা সিংহ ভল্লুক ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর নামে আকাশকে অনেক ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীরা সেই ক্যাল্‌ডিয়ান্‌দেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা তোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষত্র-মণ্ডলের কথা বলিব না,

কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতককে চিনিবার বলিয়া দিব।

তোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তর্ষি নামে নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখিয়াছ কি? সাতটি বড় বড় নক্ষত্রকে লইয়া এই মণ্ডলটি হইয়াছে। এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটা ছবি দিলাম। ইহার সাতটি নক্ষত্র কেমন সুন্দরভাবে সাজান আছে দেখিতেছ। যখন উত্তর-আকাশে সপ্তর্ষি উদয় হয়, তখন নক্ষত্রগুলিকে ঐ রকমেই সাজানো দেখা যায়।



সপ্তর্ষিমণ্ডল

চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সময়ে তোমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের খুব উপর দিকে দেখিতে পাইবে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস হইতে তাহাকে একটু-একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে দেখিবে। তার পরে ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ এই চারি মাসের সন্ধ্যাকালে যদি তোমরা সপ্তর্ষির খোঁজ কর, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতেই পাইবে না। পৌষ মাসে খোঁজ করিলে সন্ধ্যার সময়ে আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে ইহাকে একটু-একটু করিয়া উপরে উঠিতে দেখিবে।

যে ছবি দেওয়া গেল তাহার সহিত মিলাইয়া তোমরা হয় ত সপ্তর্ষিকে চিনিতে পারিবে। যদি চিনিতে না পার, তবে যাঁহারা একটু-আধটু জ্যোতিষের কথা জানেন তাঁদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়ো, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলকে চিনাইয়া দিবেন।

দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর আগে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সপ্তর্ষিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার সাতটি নক্ষত্রের মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম দিয়াছিলেন। এগুলি আমাদের দেশের বড় বড় ঋষিদের নাম। এই জন্যই এই সাতটি তারা আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়।

ইংরাজ-জ্যোতিষীরাও সপ্তর্ষির সাতটি তারার এক-একটি নাম রাখিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি দেবতা বা ঋষিদের নাম নয়। তাঁহারা ইহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল না বলিয়া ভল্লুক-মণ্ডল বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি ভল্লুকের আকৃতি করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। শেষের তিনটি তারাকে তাঁহারা ভল্লুকের লেজ বলেন।

সপ্তর্ষির একটি তারা বড় মজার। ইহাকে আমাদের জ্যোতিষীরা বশিষ্ঠ বলেন। পরিষ্কার রাত্রিতে তোমরা যদি বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক্ গায়ে একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। এটির নাম "অরুন্ধতী"। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঐ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটে না। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি

খুব ভাল তাহারাই অরুন্ধতীকে দেখিতে পায়। তোমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে।

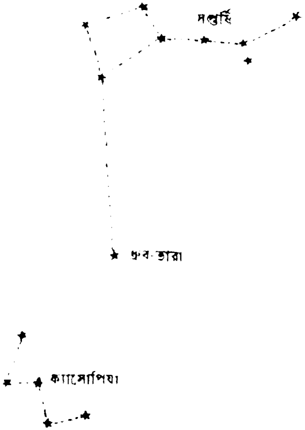
তোমরা ধ্রুব-তারার বোধ হয় নাম শুনিয়াছ। সব তারা রাত্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে অস্ত যায়, কিন্তু ধ্রুব-তারার অস্ত নাই,—উদয়ও নাই। আজ তাহাকে যেখানে দেখিতেছ, এক শত বৎসর পরে, হয় ত হাজার বৎসর পরেও তাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে। সপ্তর্ষি দিয়া এই তারাটি বেশ চেনা যায়। ছবিতে সপ্তর্ষির "ক" ও "খ" নামে যে দুটি তারা দেখিতেছ, তাহারা ধ্রুব নক্ষত্রের সহিত সর্ব্বদাই প্রায় এক রেখায় থাকে।

"ক" ও "খ"কে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একটা রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নীচের দিকে বাড়াইয়া দাও। এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এই নক্ষত্রটিই ধ্রুব-তারা। ইহা পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে; সে দূরত্ব এত বেশি যে তাহার আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বৎসর কাটাইয়া দেয়।

ধ্রুব-তারা আকাশের ঠিক্ উত্তরে থাকে এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডলও উত্তর আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি গাড়ীতে বা নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের কখনও পথ ভুল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সব নক্ষত্রদের দেখিয়া তোমরা অনায়াসে দিক্ ঠিক করিতে পারিবে। অকূল

সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্ ঠিক করা বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাপ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখা যায় না, তখন সূর্য্যকে দেখিয়া দিক্ ঠিক করিতে হয়।

উত্তর আকাশে ক্যাসোপিয়া (Cassiopeiâ) নামে একটা বড় মজার মণ্ডল আছে। ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে সারি বাঁধিয়া ঠিক ইংরাজি অক্ষর "M" বা "W"এর মত



থাকিতে দেখা যায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি দিলাম। ইহা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঠিক উল্টা দিকে থাকে।

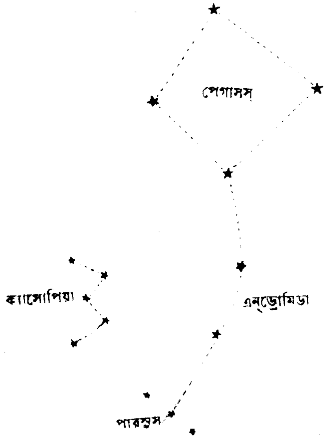
অর্থাৎ ধ্রুব-তারার এক দিকে সপ্তর্ষি এবং তাহার ঠিক উল্টা দিকে ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়। কাজেই বৎসরের যে মাসে সপ্তর্ষিকে দেখা যায় না, তখনি ক্যাসোপিয়াকে দেখা যায়।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার সময়ে উত্তর আকাশের বেশ একটু উঁচু জায়গায় তোমরা ক্যাসোপিয়াকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহাকে একবারে দেখিবে না; তখন সপ্তর্ষিকেই আকাশে দেখিতে পাইবে। ক্যাসোপিয়া ঠিক ছায়াপথের উপরে আছে; ছয়াপথ ধরিয়া উত্তর আকাশে সন্ধান করিলে উহার খোঁজ পাইবে।

আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে তোমরা ঠিক মাথার উপরকার নক্ষত্রগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়ো। সেখানে একটি বড় নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ইংরাজিতে এই মণ্ডলকে পেগাসস (Pegasus) বলে। পর পৃষ্ঠায় উহার একটা ছবি দিলাম। দেখ,—ইহার চারিটি বড় বড় নক্ষত্রে একটি বৃহৎ চতুর্ভুজের মত হইয়াছে এবং তাহার এক কোণ হইতে তিনটা বড় বড় নক্ষত্র একে একে উত্তর আকাশের নীচে নামিয়াছে। চতুর্ভুজকে যদি একখানা বড় রকমের ঘুঁড়ি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে নীচের তিনটি নক্ষত্রে ঘুঁড়ির লেজ হইয়াছে মনে হয় না কি?

ধ্রুব-নক্ষত্রকে তোমরা বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। যদি চিনিয়া থাক, তবে ধ্রুবের উপরেই তোমরা ক্যাসো-

পিয়াকে দেখিবে এবং ক্যাসোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপরে পেগাসস্‌কে খুঁজিয়া পাইবে।



তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, ঘুঁড়ি ও তাহার লেজ সকলকেই পেগাসস্ বলে, কিন্তু তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়ি-খানাই পেগাসস্ এবং তাহার লেজের তিনটি তারা এন-ড্রোমিডা-মণ্ডল। তাহা হইলে দেখ পেগাসসের লেজেই আর একটা নক্ষত্রমণ্ডল আছে।

পেগাসস্ ও এন্‌ড্রোমিডাকে যদি তোমরা চিনিয়া থাক

তাহা হইলে তোমরা পার্সিস্ রাশিকে চিনিতে পারিবে। এই নক্ষত্রমণ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ তারাটিতে আরম্ভ হইয়াছে। ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আড়া-আড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি পার্সিস্ রাশির নক্ষত্র। তোমরা আগে "আল্‌গল্" অর্থাৎ "দৈত্য-তারা"র নাম শুনিয়াছ। এটি বেশ উজ্জ্বল তারা কিন্তু প্রায় তিন দিন অন্তর ইহার আলো ভয়ানক কমিয়া আসে। এই অদ্ভুত নক্ষত্রকে তোমরা পার্সিস্-মণ্ডলে দেখিতে পাইবে। কোথায় খুঁজিলে সন্ধান পাইবে তাহা ছবিতে আঁকিয়া দিলাম। ছবি দেখিয়া আকাশে পার্সিসকে চিনিয়া লইয়ো এবং তার পরে ছবির সহিত মিলাইয়া আল্‌গলের সন্ধান করিয়ো,—তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে।

একে-একে অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ডলের কথা তোমাদিগকে বলিলাম। ক্যাসোপিয়া, এনড্রোমিডা, পার্সিস্, —এ সকলই ইংরাজি নাম। ইহাদের বাংলা বা সংস্কৃত নাম নাই। এই নামগুলির সঙ্গে কতকগুলি মজার গল্প আছে।

একটা গল্প তোমাদের বলি, শুন।

অনেক দিন আগে গ্রীসদেশে সিফস্ (Cepheus) নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া। রাজা ও রাণী অনেক দিন সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র সন্তান ছিল না। এনড্রোমিডা নামে কেবল

এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার রূপ ও গুণের কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এমন সুখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। রাজধানীর নিকটে একটা কিম্ভূতকিমাকার রাক্ষস আসিয়া প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা রাক্ষসটাকে দেখিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল,—উহার শরীরের পিছনটা সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত; তার উপরে আবার দুই পাশে দুটা বড় বড় ডানা! যাহা হউক জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। জালে ধরিতে গেলে সে জাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,—শিকারীদের বাণ তার গায়ে ঠেকিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল।

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি ঘাঁটিয়া ঠাকুর বলিলেন,—এই রাক্ষস সামান্য নয়। ইহার নাম হাইড্রা (Hydra)। স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়া সিফসের রাজ্য নষ্ট করিবার জন্য উহাকে পাঠাইয়াছেন। জলদেবতার অনেকগুলি সুন্দরী কন্যা ছিল; কিন্তু রাজকুমারী এনড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি। ইহা দেখিয়াই জলদেবতা এনড্রোমিডাকে হত্যা করিবার জন্য হাইড্রা রাক্ষসকে পাঠাইয়াছেন।

দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, এনড্রোমিডাকে খাইতে না পারিলে হাইড্রা রাজ্য ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত

হইয়া পড়িলেন। প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজবাড়িতে আসিয়া এনড্রোমিডার খোঁজ করিতে লাগিল।

রাজা ও রাণী কন্যাকে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। মত্ত প্রজারা এনড্রোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নদীর ধারের এক পাহাড়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, সেই রাক্ষসটা রাত্রিতে এনড্রোমিডাকে খাইয়া পরদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

রাজা ও রাণী এনড্রোমিডার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন এবং এনড্রোমিডা হাতে পায়ে শিকল পরিয়া একলাটি কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুপুর হইয়া গিয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে বোধ হয় এনড্রোমিডার একটু ঘুম আসিয়াছিল;—এমন সময়ে খুব বড় একটা পাখীর ডানার ঝট্‌পট্ শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসিল। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক পরমসুন্দর বীরপুরুষ তীর-ধনুক হাতে করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর পায়ের খড়মের সঙ্গে দুটা পাখীর ডানা বাঁধা,—সেই ডানার ভর করিয়া তিনি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহার নাম পার্স্যুস্, বিপদের কথা শুনিয়া রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

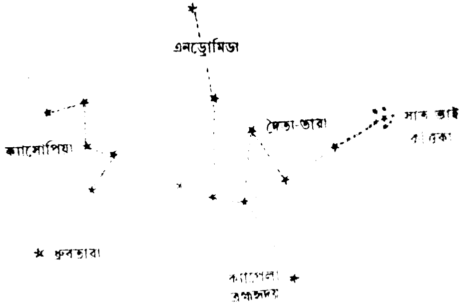
পার্স্যুস্‌কে কাছে পাইয়া এন্‌ড্রোমিডা খুব খুসী হইলেন এবং তাঁর ভয়ও কমিল। পার্স্যুস্‌ রাজকুমারীকে ভরসা দিয়া নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন হাতীর ডাকের মত একটা শব্দে এন্‌ড্রোমিডা চম্‌কাইয়া উঠিলেন। নদীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, জল তোল্‌পাড় করিয়া দশটা হাতীর মত দেহ লইয়া হাইড্রা রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাকে আর বেশি দূর আসিতে হইল না, পার্স্যুসের দুইটা তীরের আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড হইয়া গেল।

ভোর হইলে লোকে ভাবিল, এনড্রোমিডাকে বুঝি রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, বীর পার্স্যুস্‌ রাক্ষস বধ করিয়া এনড্রোমিডাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চর্য্য হইল। রাজা ও রাণী কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম সুখী হইলেন। দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। রাজা সিফস্‌ খুসী হইয়া এনড্রোমিডার সহিত পার্স্যুসের বিবাহ দিলেন এবং অর্দ্ধেক রাজ্য মেয়ে-জামাইকে দান করিলেন।

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে গল্পটি বলিলাম তাহা সত্য নয়। কিন্তু ইহাতে আগে গ্রীসের লোকেরা বিশ্বাস করিত; এবং বলিত, রাণী ক্যাসোপিয়া, রাজ-জামাতা পার্স্যুস্‌

এবং রাজকন্যা এনড্রোমিডা মৃত্যুর পর এক-একটা নক্ষত্রমণ্ডল হইয়া আকাশে রহিয়াছেন।



সিফস এবং হাইড্রাও উত্তর-আকাশের দুই স্থানে আছে। তোমরা যখন নক্ষত্রের বড় ম্যাপ দেখিয়া তারা চিনিতে শিখিবে, তখন ঐ দুইটি নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক এখন অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া যাউক। এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, ছবিতে ধ্রুব-তারা ও ক্যাসোপিয়া আছে। তার পরে পার্স্যুসের সেই তিনটি তারাও আছে। কিন্তু পার্স্যুস্-মণ্ডল এখানে শেষ হয় নাই! ছবিতে দেখিবে, একগাছি মালার মত বাঁকিয়া গিয়া পার্স্যুসের অপর তারাগুলি "সাতভাই" মণ্ডলে ঠেকিয়াছে।

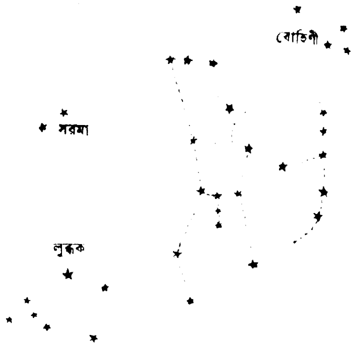
"সাত ভাইকে" তোমরা আকাশে দেখ নাই কি? কেহ

কেহ ইহাকে "সাত বোন"ও বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে ইহাকে পূর্ব্ব-আকাশে দেখিতে পাইবে। দেখিলে বোধ হইবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া মিটমিট্ করিতেছে। চেষ্টা করিলে তোমরা ইহাতে অনায়াসে ছয়টি তারা গুণিয়া বাহির করিতে পারিবে। দূরবীণে কিন্তু "সাত ভাইয়ে" প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি বলিতেন। ইহা বৃষরাশিরই একটা অংশ।

কৃত্তিকা অর্থাৎ "সাত ভাইয়ের" নীচেই তোমরা রোহিণীকে দেখিতে পাইবে। এটি লাল রঙের বেশ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেক-গুলি নক্ষত্রকে জটলা করিতে দেখিবে, সেখানেই রোহিণীকে খুঁজিয়া পাইবে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা বলিতেন, রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র।

তোমরা আকাশে "কালপুরুষ" নামক নক্ষত্রমণ্ডলকে দেখিয়াছ কি? সমস্ত আকাশে এমন সুন্দর মণ্ডল বোধ হয় আর নাই। পর পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। রেখা টানিয়া নক্ষত্রের যোগ করিয়া দিয়াছি,—ঠিক যেন একটা মানুষের মত চেহারা হইয়াছে। তাহার হাতে ধনুক আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তরোয়াল ঝুলানো আছে। ইহাই কাল-পুরুষ। ইহার ইংরাজি নাম ওরায়েন (Orion)

অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পরে, পূর্ব্ব-আকাশে তাকাইলেই তোমরা কাল-পুরুষকে দেখিতে



কালপুরুষ

পাইবে। মাঘ মাসের সন্ধ্যায় তাহাকে প্রায় মাথার উপরে দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যাকালে তাহাকে পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যাইবে। আগে আমরা কাল-পুরুষের যে একটি নীহারিকার ছবি দিয়াছি, তাহা ইহারি কোমরবন্ধের নীচে তলোয়ার খানির মধ্যে আছে। যদি দূরবীণ দিয়া কখনো নক্ষত্র দেখার সুবিধা হয়, ঐ নীহা-রিকাটিকে একবার দেখিয়া লইয়ো।

"সাতভাই" সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। "সাত-

ভাই”কে আমাদের দেশের কোনো কোনো জ্যোতিষী “মাতৃ-মণ্ডল” নাম দিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, মাতৃমণ্ডলের ছয়টি তারা সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ছয়জন ঋষির স্ত্রী। “কালপুরুষকে” লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার অন্য রকম। প্রজাপতি ও উষা নামে দুইটি দেবতার কথা আমাদের অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে শুনা যায়, প্রজাপতি ও উষা হরিণের আকৃতি লইয়া নাকি কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকাইয়া আছেন।

ঐ দুই নক্ষত্রমণ্ডল-সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, তাহা বড় মজার।

আমাদের সরস্বতী যেমন বিদ্যার দেবতা, গ্রীকদের ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে চন্দ্র-সূর্য্যের আলোর দেবতা বলিয়াও মানিত। ডিয়ানার ছয় জন সখী ছিল। তাহাদের কাজকর্ম্ম বেশি ছিল না; এইজন্য ডিয়ানা দেবী রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহারা জ্যোৎস্নার আলোতে পাহাড়-পর্ব্বতে বেড়াইয়া গান করিত ও নাচিত।

এই সময়ে গ্রীস্ দেশে ওরায়েন্ নামে এক জন ব্যাধ ছিল। সে পাহাড়-পর্ব্বতে শীকার করিয়া বেড়াইত। একদিন ঐ ছয় সখীদের সঙ্গে ওরায়েনের দেখা হইয়া গেল। তাহার হাতে ধনুক-বাণ ঢাল-তলোয়ার ছিল, তার উপরে চেহারাটাও যমদূতের মত ভয়ানক ছিল। এই সব দেখিয়া

শুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্ ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহারা দৌড়ায় কেন? সে মজা দেখিবার জন্য সখীদের পিছনে দৌড়িতে লাগিল কিন্তু তাহাদের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবার আগেই ছয় সখী ছয়টি পায়রার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি নক্ষত্রের আকারে আকাশে ভাসিয়া রহিল। গ্রীস দেশের লোকেরা বলে, ঐ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হইয়া আজও আকাশে রহিয়াছে। ইহারাই আমাদের "সাতভাই" অর্থাৎ কৃত্তিকা-রাশি। আর সেই ব্যাধটিই কালপুরুষ। এইজন্যই ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও ওরায়েন বলা হয়।

কালপুরুষ আকাশে উঠিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাড়িতে পারে নাই। ইহাও এখন একটা নক্ষত্র-মণ্ডল হইয়া আকাশে আছে। ছবিতে কুকুর-মণ্ডল তোমরা দেখিতে পাইবে। ইহার মাঝে যে উজ্জ্বল তারাটি রহিয়াছে, তাহাকে চিনিতে তোমাদের কষ্ট হইবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে সিরিয়স্ (Sirius) বা ডগ্-ষ্টার অর্থাৎ কুকুর-তারা বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার নাম দিয়াছেন "লুব্ধক"। লুব্ধকের চেয়ে উজ্জ্বল তারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। কিন্তু ইহা অনেক দূরের নক্ষত্র—ইহার আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে পথের মাঝে সাত আট বৎসর কাটাইয়া দেয়।

ভাবিয়া দেখ লুব্ধক কত দূরে আছে। আগে তোমাদিগকে যে রোহিণী (Aldebern) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা আরো দূরে আছে। ইহার আলো বত্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছায়।

যাহা হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত আকাশের নক্ষদের মিলাইয়া তোমরা লুব্ধককে চিনিয়া লইতে পারিবে।

অনেক নক্ষত্র-মণ্ডলের কথা বলা হইল। ইহা বুঝিয়া ও ছবি দেখিয়া তোমরা উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে চিনিতে পারিবে। এইরকম চেনা-পরিচয় হইলে তোমরা যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও, তাহা হইলে আকাশের অপর অংশের মণ্ডলগুলিকে চিনিতে তোমাদের একটুও কষ্ট হইবে না।

আমাদের জ্যোতিষ

নক্ষত্র-চেনা সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়া তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, নক্ষত্রদের চিনিবার এতই কি দরকার। পৃথিবীর খবর না লইলে আমাদের চলে না, তাই ভূগোল পড়া দরকার; কারণ দেশ বিদেশে চলা-ফেরা করিতে হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চিঠি-পত্র লিখিতে হয়, কিন্তু আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রে বেড়াইতে যাই না, তবে কেন আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়া রাখা হয়?

এই রকম প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিধি লইয়া সংসারের যে-সব কাজ-কর্ম্ম চলে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা বুঝিবে নক্ষত্র-মণ্ডলকে না চিনিলে একবারেই চলে না।

আজকাল আমরা সমস্ত দিনটাকে কত রকমে ভাগ করি মনে করিয়া দেখ। আমাদের সেকেণ্ড আছে, মিনিট আছে, ঘণ্টা আছে। তার পরে আবার প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল, কত কি আছে। অল্প দামের ঘড়ি এখন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কাজেই সময়ের হিসাব করিতে আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এ সুবিধা ছিল না। কাজেই চন্দ্রসূর্য্যের চলাফেরা দেখিয়াই তাঁহাদের সময় ঠিক করিতে হইত।

আবার চন্দ্রসূর্য্যের গতি ঠিক্ করিবার জন্য নক্ষত্র-চেনার দরকার হইত। এই সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে পড়িয়া তাঁহারা নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া ছিলেন।

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নির্ণয় করা হইয়াছে, তোমরা বোধ হয় জান। পৃথিবী যে সময়ে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায়, তাহাকে সমান চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের সময়টুকুকে এক এক ঘণ্টা বলা হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এরকমে সময় ভাগ করিতেন না; তাঁহারা চাঁদের গতিবিধি দেখিয়াই সময় ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা হিসাব করিয়াছিলেন, এক পূর্ণিমার পর আর এক পূর্ণিমা আসিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই তাঁহারা মাস নাম দিয়াছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতে চাঁদ কোন কোন্ নক্ষত্রের ভিতর দিয়া যায়, তাহারো হিসাব করা তাঁহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা চাঁদের পথের উপরকার নক্ষত্রগুলিকে চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন এবং যে-সব নক্ষত্রদের মাঝে চাঁদের একবার পূর্ণিমা হইল, একমাস পরে আবার সেখানেই পূর্ণিমা হয় কি না, তাঁহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখা গেল তাহা হয় না। আজ আকাশের যে জায়গায় পূর্ণিমার চাঁদকে দেখা গেল, চাঁদ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই জায়গায় আবার আসিয়া দাঁড়ায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। কাজেই স্থির করিতে

হইল, সাড়ে উনত্রিশ দিন অন্তর পূর্ণিমা হইলেও সাতাইশ দিনেই চাঁদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে।

এই রকমে গতি ঠিক্ করা হইলে চাঁদ কোন নক্ষত্র হইতে কোন্ নক্ষত্রের কাছে এক দিনে আগাইতে থাকে, তাহা ঠিক্ করা দরকার হইল। কাজেই আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা চাঁদের পথের উপরকার সব তারাকে সাতাইশটা ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং প্রত্যেক ভাগের তারা-গুলি একত্র হইয়া কি রকম আকৃতি পাইয়াছে, তাহাও ঠিক্ করিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্ব-ভাদ্রপদা, উত্তর-ভাদ্রপদা এবং রেবতী—এই সাতাইশটি নাম তোমরা বোধ হয় বাংলা পাঁজিতে দেখিয়াছ। এগুলিই চাঁদের সাতাইশ দিনের পথের সাতাইশটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম। সাধারণতঃ ইহাদিগকে "নক্ষত্র" বলা হয়।

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই রকম নাম দিয়াই ছাড়েন নাই, প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাগুলি একত্র হইয়া কিরকম আকৃতি পাইয়াছে তাঁহারা আঁকিয়া লোকদের বুঝাইয়াছেন এবং এক-একটা নক্ষত্রের অধিকারে চাঁদ প্রতিদিন কতক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিখের বিবরণটা আমরা দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে, সে দিন রাত্রি চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত শতভিষা নক্ষত্র। ইহা দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে চাঁদ আকাশের শতভিষা নক্ষত্রমণ্ডলে চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত ছিল এবং তাহার পরেই সে পূর্ব্বভাদ্রপদা নক্ষত্রে পা দিয়াছিল।

তাহা হইলে দেখ,—অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগুলা পাঁজিতে বৃথা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাহাই হউক, নামগুলি চাঁদের পথের তারাদের আকৃতি চিনাইয়া দেয়। যদি জ্যোতিষ-জানা কাহাকে কাছে পাও, তবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে চাঁদের পথটি আকাশের গায়ে ঠিক্ দেখাইয়া দিতে পারিবেন ; তখন অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রেরা কোথায় আছে তোমরা চিনিতে পারিবে।

সাধারণ লোকে এই সাতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, বোধ হয় তোমরা জান না। লোকে বলে, দক্ষ রাজার সাতাইশটি কন্যা ছিলেন, এবং তাঁহাদেরি নাম ছিল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, ইত্যাদি। দক্ষ রাজা সাতাইশ রাজকন্যার জন্য সাতাইশটি জামাইয়ের সন্ধান করিতে না পারিয়া, এক চাঁদের সঙ্গেই সাতাইশ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকারে আকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছেন। চাঁদ সাতাইশ দিনে ইঁহাদেরি এক একবার দেখা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি যে বারোটা মাসের নাম আছে, সেগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। এই সব নামের সঙ্গেও জ্যোতিষের কথা জড়ানো আছে। প্রতি-মাসেই একবার অমাবস্যা একবার পূর্ণিমা হয়, ইহা তোমরা জান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় চাঁদ আকাশের কোন্ নক্ষত্র-মণ্ডলে থাকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতেন। বৎসরের যে মাসটিকে আমরা বৈশাখ বলি, সেই সময়ে চাঁদ বিশাখা নক্ষত্রে আসিয়া পূর্ণিমা দেখাইত; তাই ঐ মাসের নাম বৈশাখ হইয়াছিল। ইহার পরের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হইত, তাই বৈশাখের পরের মাসটির নাম জ্যৈষ্ঠ হইয়াছিল। এই রকমে আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন প্রভৃতি বাকি সব মাসেরই নামের সঙ্গে এক একটা নক্ষত্র-মণ্ডলের নাম জড়াইয়া ছিল। এখন অবশ্য বৈশাখের পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রে হয় না এবং জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হয় না; তথাপি আমরা আজও পূর্ব্বপুরুষদিগের দেওয়া নামগুলিকে লইয়া বৎসরের বারোটা মাসকে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি বলি।

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সময়-বিভাগ, নক্ষত্র-বিভাগ, ইত্যাদি যাহা কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে একটুও মিথ্যা বা আজগুবী ব্যাপার থাকিত না। খাঁটি সত্য ঘটনা লইয়াই তাঁহাদের কারবার ছিল এবং সত্যগুলিকে

আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বৎসরের পর বৎসর চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপত্র করিতে হইত। আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশূন্য নয়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা যে-সব তত্ত্ব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ সব কথার মধ্যে লুকান আছে।

যাহা হউক এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা হইতে তিথি-নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন তিথির কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা দিন মাস ও বৎসরের যেরকম গণনা করিতেন তাহা আগে জানা প্রয়োজন। ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও বৎসরের কি রকম গণনা চলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এই গণনা পৃথিবীর গতি দেখিয়াই করা হয়। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, এজন্য আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা। এই রকম তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবী সূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া আসে, এজন্য চলিত বৎসরের পরিমাণ তিন শত পঁয়ষট্টি দিন। বাকি যে ছয় ঘণ্টা থাকে তাহা বৎসরের মধ্যে ধরা হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বৎসরে জমা হইয়া যখন চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা

সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয়। ইহাতে চারি বৎসর অন্তরে আটাশ দিনের ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে শেষ হইতে থাকে। কাজেই হিসাব ঠিক থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমাদের জ্যোতিষীরা পৃথিবীর ঘোরাঘুরি দেখিয়া মাস বৎসর বা দিনের হিসাব করিতেন না। চাঁদকেই তাঁরা ভাল করিয়া চিনিতেন এবং চাঁদের গতি লইয়াই সময় ভাগ করিতেন।

এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা আসিতে, সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে, একথা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহাই আমাদের "চান্দ্র মাসের" পরিমাণ। এই মাসকে যদি ত্রিশটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে যে একটু-একটু সময় পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের তিথি বা "চান্দ্রদিন"। বারো "চান্দ্রমাসে" অর্থাৎ তিন শত সাইট্ তিথিতে আমাদের এক চান্দ্র বৎসর।

ত্রিশ দিনকে যদি ত্রিশটা সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে এক একটা ভাগে চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন করিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখ,—আমাদের চান্দ্রদিন অর্থাৎ তিথিগুলা একদিনের চেয়ে একটু ছোট। ষাইট্ দণ্ডে এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় ঊনষাট দণ্ডে। এই জন্যই এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্যান্ত যে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দুইটা প্রতিপদ, দুইটা দ্বিতীয়া, দুইটা তৃতীয়া প্রভৃতি ত্রিশটা তিথি খাপ খাইয়া যায়।

আমরা চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন গণনা করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন গুণিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে মাসের ও বৎসরের হিসাবে কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। যে সময়ে চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন শেষ হইবে, সেই সময়ে তেইশ ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে না কি? আমাদের চান্দ্র বৎসর ও প্রচলিত বৎসরের মধ্যে ঠিক্ এই রকমেরই গোলযোগ আসিয়া পড়ে।

বারো চান্দ্র-মাসে তিন শত ষাইট্‌টি তিথি থাকে, কিন্তু তিথিগুলি এক দিনের চেয়ে কিছু ছোট। এজন্য দিনের হিসাব করিলে দেখা যায়, বারো চান্দ্র মাসে তিন শত চুয়ান্নটির বেশি দিন থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের তিথির বৎসর অর্থাৎ চান্দ্র-বৎসর তিন শত চুয়ান্ন দিনে শেষ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রচলিত বৎসর শেষ হইতে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয়। কাজেই চান্দ্র-বৎসর প্রত্যেক প্রচলিত বৎসরে এগারো দিন ছয় ঘণ্টা করিয়া আগে চলে।

অমিল জিনিসটাই খারাপ। তার পরে যদি সেই অমিল বৎসরের পর বৎসর জমিয়া খুব বড় হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা আরো খারাপ দেখায়।

মনে কর তোমাদের বাড়িতে রোজ যে দুই টাকার বাজার করা হয়, বাড়ির কর্ত্তা তোমাকেই তাহার হিসাব

রাখিতে বলিলেন। শাক, বেগুন, ঘি, তেল সকলেরি হিসাব তুমি খাতায় লিখিয়া ঠিক দিলে, কিন্তু দুই পয়সার যে লবণ কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া গেলে। তাহা হইলে দেখ,—দুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া তোমার দুই পয়সার অমিল হইল। কর্ত্তা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, দুই টাকার মধ্যে দুই পয়সার ভুল বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তুমি যদি এক বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ধরিয়া এই রকমে দুই পয়সার অমিল করিতে থাক, বৎসরের শেষে কত অমিল হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। সাত শত ত্রিশ পয়সা অর্থাৎ এগারো টাকা সাড়ে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া যায়। এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না। সেই রকম প্রচলিত বৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে যে এগারো দিনের তফাৎ আছে, তাহা যদি কেবল এক বৎসরের জন্য হইত তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তিন বৎসরে যখন ঐ এগারো দিন বাড়িতে বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং পাঁচ বৎসরেপঞ্চান্ন দিন হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা নজরে পড়ে। এই সময়ে এই তফাৎ ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা না করিলে চলে না।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, প্রচলিত বৎসর ও চান্দ্র-বৎসরের এই তফাৎ থাকিলে ক্ষতি কি। কিন্তু ক্ষতি যথেষ্ট আছে।

তোমরা বোধ হয় জান, আমাদের পূজাপার্ব্বণ ব্রত-উপবাস শ্রাদ্ধশান্তি সকলি চান্দ্র-দিনের হিসাবে অর্থাৎ তিথি

লইয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত দিনের চেয়ে তিথির দিন ছোট। কাজেই ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উৎসব যেমন প্রতিবৎসরেরই এক-একটা বাঁধা তারিখে হয়, আমাদের দুর্গা-পূজা বা অপর পূজাপার্ব্বণ বৎসরের কোনো একটা বাঁধা তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বৎসরেই পূজাপার্ব্বণের দিন আগেকার বৎসরের দিনের তুলনায় এগারো দিন করিয়া তফাৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তফাৎকে কখনই চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া যায় না। জমিতে দিলে, আমাদের দুর্গাপূজা হয় ত পৌষ মাসে, দোলযাত্রা হয় ত আষাঢ় মাসে আসিয়া পড়ে। শরৎকালের শারদীয়পূজা এবং বসন্তের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও বর্ষাকালে ফেলা কর্ত্তব্য? কখনই নয়। কাজেই প্রচলিত বৎসরের সহিত চান্দ্রবৎসরের তফাৎটাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

তাই আমাদের দেশের নিয়ম এই যে, চান্দ্র বৎসর এগারো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বৎসরে তেত্রিশ দিন বেশি হইয়া পড়ে, তখন একটা চান্দ্র-মাসকে হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই তেত্রিশ দিনের তফাতের পর হঠাৎ চান্দ্র-মাস ও প্রচলিত মাসের মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে।

এই রকমে বাদ-দেওয়া মাসকে কি বলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহাকে মল-মাস বলে। এই

মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেন না। কোনো যাগ-যজ্ঞ পূজা-হোম বা শুভ কার্য্য এই মাসে করা হয় না।

কেবল হিন্দুরাই যে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া বৎসর ঠিক করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরাও ঠিক এই হিসাবে বৎসর ও মাস ভাগ করেন এবং তাঁহাদেরও পূজা-পার্ব্বণ সেই হিসাবে চলে। কিন্তু আমরা যেমন তিন বৎসর অন্তর এক একটা চান্দ্র-মাসকে বাদ দিই মুসলমানেরা তাহা করেন না। এই জন্য ইঁহাদের পূজাপার্ব্বণ ঠিক্ একই ঋতুতে হয় না। ইদ্ ও মহরম মুসলমানদের বড় পার্ব্বণ। চান্দ্র-মাস হিসাবে দিন স্থির করা হয় বলিয়া এগুলি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি সকল মাসের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমাদের পাঁজিতে প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি যে সকল তিথির কথা লেখা আছে, তাহা অর্থশূন্য নয় এবং মলমাস বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহাও একবারে নিরর্থক নয়। আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্রের গতি লইয়াই এগুলির হিসাবপত্র করিতে হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা চাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দিলাম। সূর্য্য-সম্বন্ধে তাঁহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথা তোমাদিগকে কিছু বলিব। সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শত পঁইষট্টি দিনে

তাহাকে ঘুরিয়া আসিতেছে, একথা তোমরা বার বার শুনিয়াছ। সূর্য্যের উদয়-অস্ত কি রকমে হয় তাহাও তোমরা জান। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক খায়, তাই মনে হয় যেন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়।

কিন্তু সূর্য্য কি বারো মাসই আকাশের উপরকার ঠিক্ এক পথ দিয়াই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়? তাহা কখনই যায় না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য ঠিক্ মাথার উপর দিয়া চলে এবং শীতকালে সেই সূর্য্যই দক্ষিণ আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম দিকে যায়। ইহা কি তোমরা দেখ নাই? তোমাদের বাড়ীতে যদি দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দা থাকে, তবে দেখিতে পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রৌদ্র আসে। তখন ভোর বেলায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া তোমরা বারান্দায় বসিয়াই হয় ত রোদ পোহাইতে পারিবে। কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে রোদ বারান্দায় পড়িবে না, তখন সূর্য্যকে ঠিক্ মাথার উপর দিয়া পশ্চিমে যাইতে দেখিবে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, চাঁদ যেমন অমাবস্যার পর হইতে দিনে দিনে আকাশের নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া চলে, সূর্য্যও সেই রকম আকাশের নানা স্থানে জায়গা বদলাইতে বদলাইতে চলে। দিনের আলোতে নক্ষত্রদের দেখা যায় না; —দেখা গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতে সূর্য্য চাঁদের মতই নানা নক্ষত্রমণ্ডলের ভিতর দিয়া চলা-ফেরা করে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলদের উপর দিয়া চাঁদের যেমন একটা পথ আছে, সূর্য্যেরও সেই রকম পথ আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, চাঁদ সাতাইশ নক্ষত্রদের উপর দিয়া সাতাইশ দিনে একবার চক্র দেয়, সূর্য্য ঐ রকম একটা চক্র দিতে এক বৎসর অর্থাৎ তিন শত পঁইষট্টি দিন সময় লয়।

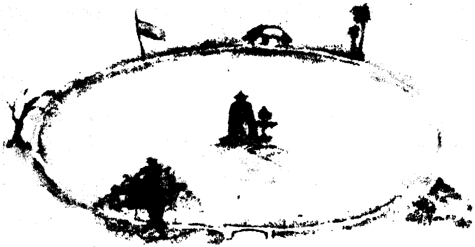
তোমরা এই কথা শুনিয়া বোধ হয়, একটু গোলযোগে পড়িতেছ। চাঁদ সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে, কাজেই সে ঐ সময়ে সাতাইশ নক্ষত্রদের উপর দিয়া চলে। একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সূর্য্য ত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক্ খায় না; তবে কেন তাহাকে আকাশের নক্ষত্রদের উপর দিয়া তিনশত পঁইষট্টি দিনে চক্র দিতে দেখা যাইবে?

এই প্রশ্ন তোমাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন আমরাও ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতাম না। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বুঝিবে।

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবির মাঝে একটা ছোট মন্দির রহিয়াছে এবং মন্দিরটিকে ঘিরিয়া একটা গোল রাস্তা আছে। ঘরবাড়ী গাছপালা সবই রাস্তার বাহিরে দূরে দূরে আছে।

এখন মনে কর, তুমি যেন ছবির বট গাছের কাছ হইতে গোলাকার রাস্তা ধরিয়া ডানদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে এবং মাঝে মাঝে মন্দিরটার দিকে তাকাইতে লাগিলে।

বট গাছের কাছে দাঁড়াইয়া তুমি যদি মন্দিরটিকে দেখ, তবে মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? রাস্তার ধারের ঐ তাল-গাছটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে না কি ? মন্দির



যদি রাস্তা হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলেও উহাকে তালগাছটার একবারে গায়ে লাগানো দেখা যাইবে।

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির সাঁকোর কাছে দাঁড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? আর তাল গাছটিকে দেখিবে না ; বোধ হইবে যেন, ঐ ছোট কুঁড়ে ঘরটির গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। তার পরে তুমি রাস্তার উঁচু ঢিবিটার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে ; তখন কুঁড়ে ঘরটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে না, তখন ঐ নিশানটির গায়ে মন্দির আসিয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ,—তুমি যেমন বট গাছ এবং সাঁকো প্রভৃতি জায়গা পার হইয়া রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিবে, তেমনি প্রথমে তালগাছ, তার পরে কুঁড়ে ঘর, তার পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোটা জিনিসের গায়ে মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে।

এই উদাহরণের কথাটা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের গতির কথাও তোমরা বুঝিবে। তুমি যেমন গোল রাস্তায় চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি আকাশের উপরকার এক গোল রাস্তায় চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর রাস্তার বাহিরে অবশ্য গাছপালা ঘরবাড়ী কিছুই থাকে না; থাকে কেবল নক্ষত্রমণ্ডল। কাজেই তুমি যেমন মন্দিরটিকে একবার তালগাছের গায়ে, তার পরে কুঁড়ে ঘরের উপরে একে একে দেখিলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে ঠিক তেমনি করিয়া একবার এক নক্ষত্রমণ্ডলে, তার পর আর এক নূতন নক্ষত্রমণ্ডলে পরে পরে দেখা যায়।

তুমি কতক্ষণে ছবির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকে ঘুরিয়া আসিতে পার জানি না। কিন্তু পৃথিবী এক বৎসরে তাহার গোল রাস্তা দিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। কাজেই আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া আকাশের নানা নক্ষত্র-মণ্ডলের উপর দিয়া সূর্য্যকে এক বৎসরে ঘুরিয়া আসিতে দেখি। নক্ষত্র-মণ্ডলের উপর দিয়া সূর্য্যের এই পথটাকে রাশিচক্র বলা হয়।

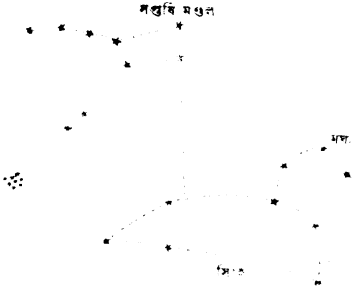
জ্যোতিষীরা রাশিচক্র অর্থাৎ সূর্য্যের রাস্তার উপরকার সব নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বারোটা ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমণ্ডলের এক-একটা নামও দিয়াছেন। বৈশাখ মাসে সূর্য্য রাশিচক্রের যে অংশটুকু ধরিয়া চলে তাহার নাম মেষ রাশি, জ্যৈষ্ঠ মাসের অংশ বৃষ রাশি, আষাঢ় মাসের অংশ মিথুন রাশি ইত্যাদি।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, গাড়ীর চাকার মত ছবি আঁকিয়া তাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন নাম দিয়া যে বারোটা ছবি দেওয়া হয়, তাহার গভীর অর্থ আছে। ঐ চাকাটি সূর্য্যের ভ্রমণ-পথেরই ছবি। নামগুলি তাহারি উপরকার নক্ষত্রমণ্ডলের নাম এবং আকৃতিগুলি ঐ সকল নক্ষত্রমণ্ডলেরই আকৃতি। এই বারোটা নক্ষত্রমণ্ডলের প্রত্যেকটাকে এক-একটা রাশি বলা হয়।

তোমরা মেষ দেখিয়াছ এবং বৃষও অনেক দেখিয়াছ। মেষ ও বৃষরাশিতে নক্ষত্র দিয়া আকাশে একটা বড় ভেড়া এবং একটা মোটা ষাঁড় আঁকা আছে, একথা তোমরা মনে করিয়ো না। বারোটা রাশির মধ্যে হয় ত দুই তিনটির আকৃতি ঠিক নামেরই মত দেখিতে পাইবে; বাকি গুলিতে নামের সহিত আকৃতির মিল খুঁজিয়া পাইবে না।

আমরা এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর এই তিনটি রাশির ছবি দিলাম। মেষ প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চম রাশি, বৃশ্চিক অষ্টম রাশি এবং মকর দশম রাশি। এই জন্য

পঞ্চম মাসে অর্থাৎ ভাদ্রে সূর্য্য সিংহ রাশিতে পৌঁছায়, অষ্টম মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণে সূর্য্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকে এবং



সিংহ রাশি

সংবৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ মাঘে সূর্য্য মকর রাশিতে আসিয়া দাঁড়ায়।

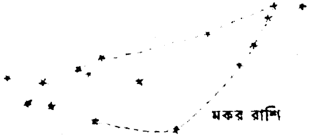
সিংহ রাশির যে ছবি দিলাম, তাহা হইতে হয় ত তোমরা ইহাকে চিনিয়া লইতে পারিবে। চৈত্র মাসের প্রথমে সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়। সিংহের পায়ের গোড়ায় যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি রহিয়াছে এইটিকেই মঘা বলে। এই রাশির নক্ষত্রদের আকৃতির সহিত সিংহের আকৃতির কতকটা মিল দেখিতে পাইবে।

বৃশ্চিক রাশিটাও দেখিতে কতকটা বিছার মত। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে দক্ষিণ আকাশে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছায়াপথের উপরে ইহার খানিকটা থাকে, এজন্য বৃশ্চিককে চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না।



বৃশ্চিক রাশি

মকররাশির যে ছবিটা দিলাম তাহার সহিত মকরের একটুও মিল নাই। ইহাতে কতকগুলি ছোট ছোট তারাই আছে। আশ্বিন মাসের সন্ধ্যার সময়ে এই রাশিকে দক্ষিণ আকাশে খুব উপরে দেখা যায়।


মকর রাশি

তোমরা এই কয়েকটা রাশিকে যদি চিনিয়া লইতে পার, তাহা হইলে রাশিচক্রটা আকাশের উপর দিয়া কি রকমে চলিয়াছে বুঝিতে পারিবে।

যদি সূর্য্যের ভ্রমণ ও রাশিচক্রের কথা তোমরা বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আমাদের পাঁজিতে যে সংক্রান্তির কথা

লেখা দেখিতে পাও তাহার গোড়ার খবরও বুঝিতে পারিবে। মাসের শেষ তারিখকেই সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ হয় তোমরা জান। ঐদিনে সূর্য্য তাহার পথের এক রাশি হইতে আর এক রাশিতে "সংক্রমণ" অর্থাৎ গমন করে বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে।

১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাস ত্রিশ দিনে শেষ হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসটা বৎসরের অষ্টম মাস, একজন্য রাশিচক্রের অষ্টম স্থান অর্থাৎ তুলারাশিতে সূর্য্য সমস্ত কার্ত্তিক মাস কাটাইয়াছিল। ৩০শে কার্ত্তিক সে তুলা ছাড়িয়া বৃশ্চিকে পা দিয়াছিল, একজন্য ঐ দিনটা একটি সংক্রান্তি হইয়া পড়িয়াছিল। এই রকমে বারোমাসে বারোটা রাশিতে পা দিবার সময়ে মোটামুটি বারোটা সংক্রান্তি হয়।

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পাঁজিতে রাশিচক্র এবং মেষ বৃষ ইত্যাদি বারোটা ছবি দেখিতে যতই অদ্ভুত হউক, এগুলির গোড়ায় গভীর অর্থ আছে।